প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩২ ❖ ৫ - ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নিঃস্বার্থ সেবাদানে বিশ্বজননী মাদার তেরেজা

মাদার তেরেজার ভালোবাসা
ও সেবার ব্রত; সর্বজনকে করে অনুপ্রাণিত

অরুন দাসের কন্যার হাতে দয়াপুর চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর

মুশুরীখোলা দায়ূদ নগর খ্রিস্টান কলোনীতে
টমাস রবিন হালদারের বাড়ি

## মুশুরীখোলা ও কিছু খ্রিস্টীয় আদি ভূমি এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ

# ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

## মা, তোমাকে অজস্র প্রণাম

**প্রয়াত মারীয়া সরকার**
মৃত্যু : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াত স্বামী : জেরোম সরকার
(প্রয়াত আন্তনী মন্তি গমেজ ও
প্রয়াত ম্যাগডালেনা গমেজ-এর মেজ কন্যা)
ধর্মপল্লী : লক্ষীবাজার, ঢাকা

আর তো তুমি মরণাপন্ন রোগিদের নিয়ে
হাসপাতালে হাসপাতালে দৌঁড়াবে না
আর তুমি সবার জন্য গ্রোটোর সামনে দাঁড়িয়ে
একটানা প্রার্থনা করবে না।
তোমার সহজ-মধুর সম্বোধনটি কানের কাছে
বাজতে থাকবে।

*হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার কনিষ্ঠ পুত্র*

**শোকার্ত স্বজন**
জন, বেবী, মারীয়া (কৃপা), হিউবার্ট (তীর্থ), তিমথী (অর্ঘ্য)
ফিলিপ, জয়া, এলেন ও এঞ্জেলা
মালা, মিঠু ও আর্থার।

বিজ্ঞ/২৩০/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩২
০৫ - ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২১ - ২৭ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit: :** www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

## বাংলার খ্রিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাসে অনন্য ব্যক্তিত্ব কোলকাতার সাধ্বী তেরেজা

৫ সেপ্টেম্বর কোলকাতার সাধ্বী তেরেজার স্মরণদিবস। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৫ সেপ্টেম্বর কোলকাতাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়েছে। কেননা তাঁর মধ্যদিয়ে বিশ্ববাসী উপলব্ধি করছিল ভালোবাসার শক্তি। জন্মসূত্রে আলবেনীয় হয়েও মানবতার রাণী মাদার তেরেজা বিশ্ব নাগরিক। মানব সেবায় তিনি বিশ্ব দরবারে সবার কাছে অনন্যা, অতুলনীয়া ও প্রশংসিতা। দীন-দরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও সেবা কাজ ভারত, বাংলাদেশসহ বিশ্বের কাছে সমাদৃত। জাতিতে কৃষ্টিতে বাঙালি নন ইউরোপীয় কেননা তিনি আলবেনীয়। ইউরোপের কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠলেও খ্রিস্টের ভালবাসার সংস্কৃতি পরিবার থেকেই পেয়েছেন ও তাতে দৃঢ় হয়েছেন। মায়ের কঠিন পরিশ্রমী মনোভাব ও দৃঢ় খ্রিস্ট বিশ্বাস মাদার তেরেজাকে সাহস যুগিয়েছিল স্রোতের বিপরীতে গিয়ে খ্রিস্টের ভালবাসাকে সকলের কাছে বিলিয়ে দিতে।

মাদার তেরেজা মননে চিন্তা-চেতনায় দীনদুঃখীদের পথের সাথী। তাইতো যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ছুটে গেছেন। লরেটো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত সুসজ্জিত পোষাক ছেড়ে তিনি বাংলার ঐতিহ্য শাড়ি পরিধান করলেন। নীল পাড় সাদা শাড়ি বেছে নিলেন নিজের সংঘকে চিহ্নিত করতে। বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় শুরু করেন মিশনারীজ অফ চ্যারিটি সংঘটি। বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানেও তিনি তাঁর ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দেন। স্থাপন করেন তাঁর সংঘ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর খুলনা ধর্মপ্রদেশের তৎকালীন বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মাদার তেরেজা যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের অসহায় ও দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দেন। পরবর্তীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তৎকালীন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর আমন্ত্রণে মাদার তেরেজা বাংলাদেশে মিশনারীজ অফ চ্যারিটি সংঘটির বিভিন্ন হাউজ খোলেন। যুদ্ধোত্তরকালে অবাঞ্চিত শিশুদের জন্য ইসলামপুরে শিশু সদনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে দরিদ্র মানুষের জন্য বিভিন্ন হাউজ খোলেন। বর্তমানে মিশনারীজ অফ চ্যারিটির সিস্টারগণ শিক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য সেবাসহ দরিদ্র, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন হত-দরিদ্রদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসাসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। মাদার তেরেজার সেবা কাজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ সব শ্রেণীর মানুষের জন্য। মাদার তেরেজা বলতেন, "দরিদ্র মানুষ আমাদের কাছে ভালোবাসা চায় আর ভালোবাসার ফল হচ্ছে সেবাকাজ"। আর সেই ভালোবাসার হাতই তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষের প্রতি। এই ভালোবাসার মধ্যদিয়ে তিনি দরিদ্র মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পাশাপাশি তাদের জীবনে দিয়েছেন বেঁচে থাকার নতুন আশা। এইভাবে তিনি মানব মর্যাদা ও মানুষের জীবনের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ধন্যা মাদার তেরেজাকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর সাধ্বী ঘোষণা বাংলা ভাষাবাসী খ্রিস্টানদের জন্য অনন্য এক গৌরবময় ঘটনা।

ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলীর বীজ রোপিত হয়েছিল। তৎকালীন যেসব স্থানগুলোতে খ্রিস্টমণ্ডলীর বীজ রোপিত হয়েছিল সেই স্থানগুলোর নাম জানা গেলেও সেগুলোর অবস্থান অনেকটা অস্পষ্ট। কেননা সেগুলোর অনেকগুলো এখন বিলুপ্তির পথে। ইতিহাসে জানা যায় যে, তৎকালীন মেঘুলা-মালিকান্দা-অরিকুল-লরিকুল-নারিশা- মুশুরীখোলা নামক স্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হয়েছিল। ইতিহাস বলে, ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তনীয় দ্য রোজারিও ধর্মনগর- তেলিহাটিসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাণী প্রচার করেছেন। তিনি প্রায় ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষের কাছে খ্রিস্টকে পরিচয় করিয়েছিলেন। সেই সময়ের খ্রিস্টানরা ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা, ভাওয়াল, গোরাঘাট ও আসামের রাঙ্গামাটিসহ ৬০/৬৫টি গ্রামে বসবাস করত। অথচ উল্লিখিত এলাকাগুলোতেই পাঁচশত বছর আগের প্রাচীন সেই কাথলিক ধর্মবিশ্বাসী অধ্যুষিত জনপদের গ্রাম, নগর বা বন্দর বিলীন হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। কিছু কিছু এলাকা বা গ্রামের নাম পরিবর্তিত হয়ে অন্যকোন নাম ধারন করেছে। আবার কোথাও দেখা যায়, গ্রাম বা নগর আছে, কিন্তু সেখানে একটিও খ্রিস্টান ঘর-বাড়ী নেই। তবে খ্রিস্টানদের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাসের একটি নিদর্শন হলো 'মালিকান্দা খ্রীষ্টান কবরস্থান'। সেখানে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে; যার পুরাতন নাম 'ফিরিঙ্গি স্কুল'। এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে খ্রিস্টানদের প্রাচীন বসতি বা স্থানের কথা শোনা যায়। যেগুলোতে এখন খ্রিস্টানদের উপস্থিতি একদম নেই। কিন্তু ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এবং নিজেদের শিকড় খুঁজে পেতে খ্রিস্টানদেরকে আরো বেশি গবেষণা করতে হবে। আশাপ্রদ দিক যে, ইতোমধ্যে অন্যধর্মের কোন কোন ভাইবোনেরা বঙ্গে খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব বা খ্রিস্টধর্মের কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব/সংঘকে নিয়ে গবেষণা করে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। সাধু আন্তনীর পালাগান নিয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনে যিশুসংঘী ফাদার প্রদীপ পেরেজকে অভিনন্দন। খ্রিস্টান ভাইবোনেরাও নিজেদের ঐতিহ্য-ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শিঘ্রই গবেষণা শুরু করবে এ প্রত্যাশা করি। এ গবেষণা করতে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসবে বলে বিশ্বাস করি॥ †

ইনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন। - (মার্ক ৭:৩৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

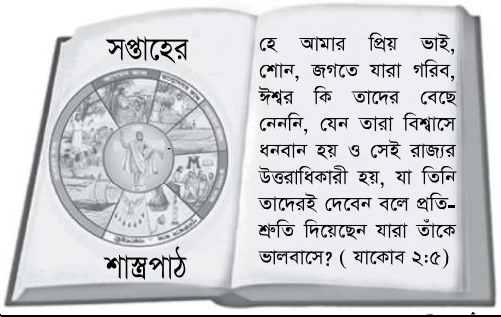


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫ - ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার**

ইসাইয়া ৩৫: ৪-৭, সাম ১৪৬: ৬গ-৭, ৮-১০, যাকোব ২: ১-৫, মার্ক ৭: ৩১-৩৭

**৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার**

কলসীয়, ১: ২৪--- ২: ৩, সাম ৬২: ৫-৬, ৮, লুক ৬: ৬-১১

**৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**

কলসীয় ২: ৬-১৫, সাম ১৪৫: ১-২, ৮-১১, লুক ৬: ১২-১৯

**৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার**

**কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব-এর পর্ব**

মিখা: ৫: ১-৪ক; অথবা রোমীয় ৮: ২৮-৩০, সাম ১৩: ৫-৬, মথি ১: ১-১৬, ১৮-২৩ (অথবা ১৮-২৩)

**৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**

কলসীয় ৩: ১২-১৭, সাম ১৫০: ১-৬, লুক ৬: ২৭-৩৮

**১০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**

১ তিমথি ১: ১-২, ১২-১৪, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-৮, ১১, লুক ৬: ৩৯-৪২

**১১ সেপ্টেম্বর, শনিবার**

**মা মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ**

১ তিমথি ১: ১৫-১৭, সাম ১১৩: ১-৭, লুক ৬: ৪৩-৪৯

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার**

+ ১৯৯৮ ফাদার মার্কো মাত্যিয়াজ্জী এসএক্স (খুলনা)

**৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার**

+ ১৯৮৫ ব্রাদার ইভান সিস্টার ডলেন, সিএসসি (ঢাকা)

**৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**

+ ২০১২ সিস্টার মেরী বেনিগ্না এসএমআরএ

**৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার**

+ ১৯৭৪ সিস্টার এলিজাবেথ ও' ব্রায়েন এসএমএসএম

**১০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**

+ ১৯২৬ সিস্টার এম. এ্যান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৪২ সিস্টার এম. আগষ্টিন অব যীজাস আরএনডিএম (ঢাকা)

**১১ সেপ্টেম্বর, শনিবার**

+ ১৯৯১ ফাদার আন্তোনীয় বনোলো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সিস্টার এম. যোয়ান অফ আর্ক স্পেইটস সিএসসি

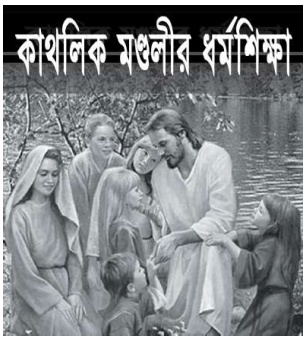


## পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

### দৃঢ়ীকরণের চিহ্নসমূহ ও অনুষ্ঠান-রীতি

**১২৯৪ :** তেল দ্বারা অভিলেপন সংস্কারীয় জীবনেও এই সমুদয় অর্থ বহন করে। দীক্ষাপ্রার্থীদের তেল দ্বারা দীক্ষাস্নান-পূর্ব অভিলেপন হচ্ছে পরিশুদ্ধ ও শক্তিশালী করণের নিদর্শন; রোগীদের অভিলেপন নিরাময় ও আরাম প্রকাশ করে। পবিত্র অভিষেক- তেল দ্বারা দীক্ষাস্নানোত্তর অভিলেপন হচ্ছে দৃঢ়ীকরণ এবং পুণ্য পদাভিষেক উৎসর্গীকরণের চিহ্ন। দৃঢ়ীকরণ দ্বারা খ্রিস্টানগণ, অর্থাৎ অভিষিক্তজনেরা আরও পূর্ণভাবে যিশু খ্রিস্টের মিশনদায়িত্বে এবং পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় অংশগ্রহণ করে, যে পবিত্র আত্মায় খ্রিস্ট নিজেই পরিপূর্ণ, যাতে খ্রিস্টানগণের জীবন "খ্রিস্টের সৌরভ" ছড়াতে পারে।

**১২৯৫ :** এই অভিলেপন দ্বারা দৃঢ়ীকরণপ্রার্থীরা লাভ করে সেই "চিহ্ন", অর্থাৎ পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কন। মুদ্রাঙ্কন হল একজন ব্যক্তির প্রতীক, ব্যক্তির ক্ষমতা, অথবা একটি বস্তুর মালিকানার চিহ্ন। তাই সৈন্যরা তাদের অধিনায়কের এবং ক্রীতদাসরা তাদের মনিবের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হত। মুদ্রাঙ্কন একটি বিচারসম্বন্ধীয় বিষয় বা দলিলের সত্যতা প্রমাণ করে, এবং কখনো কখনো এগুলোতে গোপনীয়তা আরোপ করে।

**১২৯৬ :** খ্রিস্ট নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি পিতার মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছেন। খ্রিস্টানগণও মুদ্রাঙ্কন দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে: "স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিস্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তেল-অভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিত করেছেন তার আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসেবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েচেন। পবিত্র আত্মার এই মুদ্রাঙ্কন, আমরা যে সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্ট-সংস্থিত, চিরকালের জন্য আমরা যে তাঁর সেবা কর্মে তালিকাভুক্ত, এবং সেই সঙ্গে অন্তিমকালীন মহাপরীক্ষার সময়ে ঐশসুরক্ষার অঙ্গীকারপ্রাপ্ত, প্রভৃতি চিহ্নিত করে।

**১২৯৭ :** পবিত্র অভিষেক-তেলের আশীর্বাদ দৃঢ়ীকরণ অনুষ্ঠানের পূর্বে সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া, তবে একদিকে দৃঢ়ীকরণ অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ। পুণ্য বৃহস্পতিবার অভিষেক-তেল আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগে, বিশপ তার গোটা ধর্মপ্রদেশের জন্য পবিত্র অভিষেক-তেল আশীর্বাদ করেন। কোন কোন প্রাচ্য মণ্ডলীতে এই আশীর্বাদ পাত্রিয়ার্কের অধিকারেই ন্যস্ত থাকে। আন্তিয়োখের উপাসনা-অনুষ্ঠানে পবিত্র অভিষেক-তেল (myron) আশীর্বাদের জন্য পবিত্র আত্মার আবাহন-প্রার্থনাটি নিম্নরূপ: "(পিতা.... তোমার পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ কর) আমাদের উপরও আমাদের সম্মুখে রক্ষিত এই তেলের উপর, এবং তুমি এই তেল পবিত্র কর, যাতে এই তেল দ্বারা যারা অভিলেপিত ও চিহ্নিত হবে তাদের সকলের জন্য এই তেল হয়ে উঠে পবিত্র অভিষেক-তেল, যাজকীয় অভিষেক-তেল, রাজকীয় অভিষেক-তেল, আনন্দের অভিলেপন, আলোর পরিবসন, পরিত্রাণের উত্তরীয়, এক আধ্যাত্মিক দান, আত্মা ও দেহের পবিত্রীকরণ, অবিনশ্বর সুখ, অক্ষয় মুদ্রাঙ্কন, খ্রিস্টবিশ্বাসের ঢাল এবং শয়তানের সকল কাজের বিরূদ্ধে ভীতিপ্রদ শিরস্ত্রাণ।"

## অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১২ সেপ্টেম্বর, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-এর বিশপীয় পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। - *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

# নিঃস্বার্থ সেবাদানে বিশ্বজননী মাদার তেরেজা

**দুর্জয় মিখায়েল দিও**

**-দূর আলবেনিয়া থেকে**
**এলো কলকেতাতে এ কে ?**
**-ধুৎ তেরিকা**
**মা টেরিজা**
**চিনতে পারিসনে কে।**
*(কবি নবনীতা দেব সেন)*

মাদার তেরেজা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার স্কপিয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন সে দেশের নাম ছিল ম্যাসিডোনিয়া। পরবর্তীতে আরও কিছু এলাকা নিয়ে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে দেশটির নামকরণ করা হয় যুগোস্লাভিয়া। স্কপিয়ে ছিল ছোট একটি শহর যার লোকসংখ্যা ছিল ২৫ হাজারের মতো। এই স্কপিয়ে শহরটি ছিল আলবেনিয়ার একটি রাজ্য। তেরেজা নাম ধারণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আগ্নেশ গোনাস্কা বোজাজিউ। তাঁর পিতা নিকোলাস বোজাজিউ এবং মাতা দ্রানাফিল বার্নাই।

বাবা-মার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে আগ্নেশই সবার ছোট। তাদের পরিবারটি আনন্দে-ভরপুর একটি পরিবার ছিল। আগ্নেশ খুব অল্প বয়সেই বাবাকে হারান, আর তার মা-ও বেশ কয়েকমাস যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সুস্থ হয়ে তার সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন ব্যবসা, এমব্রয়ডারি-র কাজ করা কাপড় বিক্রির ব্যবসা। অন্যদিকে আগ্নেশের বাবার পার্টনার তাঁর বাবার ভাগের পাওনা ব্যবসার টাকা আত্মসাৎ করে। যার ফলে একপর্যায়ে আগ্নেশের পরিবারকে পথে বসতে হয়। উপায়ান্তর না দেখে আগ্নেসের মা নিজের ব্যবসাকেই আরও নিবিড়ভাবে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন । তিনি তার সর্বোচ্চ দিয়ে তার ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা শুরু করলেন, অসীম ভালবাসায় তিনি তাদের আগলে রাখতেন ও যত্ন নিতেন। এইভাবেই পরিবারের সঙ্গে তেরেজার জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল সময়গুলো কাটে ।

বারো বছর বয়সে আগ্নেশের মনে সন্ন্যাসিনী হবার দৃঢ়-বাসনা জেগে ওঠে। তেরেজা ও তাঁর মা নিয়মিত গির্জায় যেতেন ও প্রার্থনা করতেন। এইভাবেই তেরেজার জীবনে সন্ন্যাসিনী হবার ইচ্ছা দিনদিন আরও প্রবল হতে থাকে। তাৎক্ষণিকভাবে তেরেজার এই তীব্র ইচ্ছার প্রতি তাঁর মা অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে নিয়তির অমোঘ টানে তাঁর মা তেরেজাকে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করেন। তার এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপদান করতে আগ্নেশ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়ে সাত সপ্তাহ পরে কলকাতায় পৌঁছেন। এর কিছুদিন পরই তাকে দার্জিলিংয়ে লরেটোর নভিশিয়েটদের আশ্রমে পাঠানো হয়। ঐ সময় দার্জিলিংয়ে সেই নভিশিয়েট অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে যে আশ্রমে থাকতে হত সেখানে ছিলেন সিস্টার মেরী টেরেস ব্রিন। বলা যায় যে, তেরেজার জীবনে প্রার্থনার অভ্যাসটি সেখান থেকেই গড়ে উঠল। এর অতিরিক্ত কাজ হিসেবে তিনি দু'ঘণ্টা করে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদান করতেন, এদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে গরিব-অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার চিন্তা তার মনের মুকুরে উঁকি দেয়। তেরেজা সবসময় ভাবতেন সুন্দর ও সত্যকে নিয়ে, আর ভাবতেন জীবনের ত্যাগের মহিমা নিয়ে।

কলকাতায় প্রথম তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মে তিনি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট মেরী তেরেজা নতুন সজ্জায় আবির্ভূত হলেন ভারতবাসীর কাছে। তিনি তাঁর পরিধেয় লরেটোর মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে তুলে নিলেন ভারতীয় নারীর মতো নীল পাড়ের সাদা শাড়ি। কাঁধের সাথে এঁটে দিলেন ক্রুশচিহ্ন। পরবর্তীতে মাদার তেরেজা এ বিষয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করে বলেন: "আমি ভারতীয়দের সেবা করছি ভারতীয় পোশাকই তো পরব।" সময় বয়ে চলল মেরি তেরেজার; ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চের কোনো একদিনে মেরি তেরেজা আর্চবিশপের কাছ থেকে পেল খেতাব: **"মাদার তেরেজা"**। বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হল সে নাম। ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেন মাদার তেরেজা হিসেবে। মানুষের মনের মুকুরে স্থান দখল করে নিলেন, হয়ে উঠলেন বিশ্বজননী "মাদার তেরেজা"।

বিশ্বজননী মাদার তেরেজা তার সেবা কাজের মধ্যদিয়ে বিশ্বের এক জননী হয়েছেন কেননা তিনি মানুষদেরকে এত ভালবাসতেন যে, যে কোনো সেবাকাজে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না, সকল কাজে তিনি সদা-সক্রিয় ছিলেন। যে সেবাগুলো তিনি প্রদান করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল: দরিদ্রদের সাহায্য করা, রোগীদের সেবা করা, অনাথ শিশুদের দেখাশুনা করা, তাদের জন্য খাবার দেওয়া এমনকি যারা কুষ্ঠরোগী তাদের তিনি সেবা করতেন। প্রকৃত অর্থে, তাঁর কাছে রাষ্ট্র ও ধর্মের কোন ভেদাভেদ ছিল না। মাদার তেরেজা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন ব্যক্তি। তিনি তাঁর ভালবাসা দিয়ে মানুষের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনকালে প্রাপ্ত কোন পুরস্কারের অর্থই তিনি নিজের কাজে ব্যয় করেননি, ব্যয় করেছেন দীন-দুঃখী-অসহায় মানুষের কল্যাণে। এমনকি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যে বিশাল ভোজসভার আয়োজন করা হয় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, মাদার সেই অর্থ চেয়ে এনেছেন অসহায় গরিব মানুষের ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে এবং ব্যয় করেছেন পথে-ঘাটে পড়ে থাকা দারিদ্রক্লিষ্ট-অসহায় মানুষ ও পথশিশুদের পেছনে। তাই তিনি **বিশ্বজননী**, **মানবতার মা** এবং স্বীকৃত **'আদর্শ মানুষ'** হিসেবে অভিহিত হয়েছেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ও তিনি বসে থাকেননি। তিনি ছুটে আসেন বাংলাদেশে, প্রার্থনা করেন বাঙালিদের কষ্ট লাঘবের জন্য। ঢাকায় এসে মিশনানিজ অব চ্যারিটিজ নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান খোলেন, যার মাধ্যমে দুস্থ যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ক্ষুধা পীড়িত আর্তমানবতার সেবা কর্ম পরিচালনা করেন। একে একে তিনি এই সেবা কেন্দ্রের ১০টি শাখা খোলেন। ঢাকার ইসলামপুরে প্রথম শাখাটি গড়ে তোলার পর খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল, সিলেট ও কুলাউড়াতে নির্মল হৃদয় আর নির্মলা শিশু ভবন নামে কয়েকটি সেবাসদন স্থাপন করেন তেরেজা। ঢাকার টঙ্গীতে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্মলা কেনেডি খুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠান তৈরী করা যত সহজ তা ঠিক মত পরিচালনা করা তত কঠিন, অথচ মাদার তেরেজার সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ মাদার তেরেজার আত্মত্যাগী ও সেবার জীবনকে অনুসরণ করার মধ্যদিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বাংলাদেশে মিশনারিজ অব চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুন্দরভাবে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

শিশুর প্রতিটি কথা আত্মিক শক্তি, তার সকল কথাই জীবন। বাইবেলের বাণীটি তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন সেটি হলো, যা কিছু করেছ তোমার ক্ষুদ্রতম ভাই-বোনদের প্রতি তা করেছ আমার প্রতি *(মথি ২৫: ৪০)*। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের ভালবেসে ও সেবা কাজের মধ্যদিয়ে তিনি তার

*(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

# মাদার তেরেজার ভালোবাসা ও সেবার ব্রত সর্বজনে করে অনুপ্রাণিত

**রনেশ রবার্ট জেত্রা**

স্রষ্টার সৃষ্টি এই পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা তীর্থযাত্রী হিসেবে বিচিত্র আমাদের পথ চলা। তবে এই বিচিত্রতার মধ্যে আমাদের যাত্রার গন্তব্যস্থান হলো আমাদের স্বর্গস্থ পিতা বা স্বর্গে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা। পার্থিব ও মানবিক সবকিছুর মধ্যদিয়েই আমাদেরকে তীর্থ পথে এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের এ তীর্থ যাত্রায় অন্যকে যে যত বেশি ভালোবেসে আপন করে নিতে পারে, একে-অপরের সেবায় যে যত বেশি আন্তরিক হতে পারে, অন্যের সুখ-দুঃখকে যত বেশি নিজের করে নিয়ে অন্যের কল্যাণে আত্মনিবেদন করতে পারে, তারাই আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়, বরণীয় এবং অনুকরণীয় হয়ে থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনই একজন চিরস্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের সবার মমতাময়ী মা – **সাধ্বী মাদার তেরেজা**। যিনি বিশ্বমাতা নামেও পরিচিতি লাভ করেছে।

ভালোবাসা এমন একটি মানবীয় শ্রেষ্ঠ গুণ, যার টানে একজন ছুটে যায়, আরেকজনের কাছে। আর এই শ্রেষ্ঠ গুণটিই পরিপূর্ণ ছিল আমাদের প্রিয় সাধ্বী মাদার তেরেজার জীবনে। এই ভালোবাসার টানেই তিনি সুদূর আলবেনীয়া ছেড়ে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি দীন-দরিদ্রের সেবা করার উদ্দেশে প্রথমত লরেটো সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। কিন্তু সে সম্প্রদায়ে কাজ করার সময়ে তিনি কোলকাতার রাস্তাঘাটে ও বস্তির অভাবী অসহায় মানুষদের দেখে ব্যথিত হন। মূলত লরেটো সম্প্রদায়ে থাকাকালীন সময়েই শুরু হয় তাঁর মানবসেবার কাজ। গরীব, দুঃখী, অভাবী, বস্তিবাসী, রোগাক্রান্ত মানুষের সেবায় নিজেকে মানবসেবীরূপে উৎসর্গ করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলেন। তিনি একসময়ে ভাবতেন এবং নিজেকে প্রশ্ন করতেন সর্বজনীন ভাবে সকলের সেবা করা, আমার আহ্বান আমি কি নির্দিষ্ট গণ্ডীর বা চার দেয়ালের মধ্য আবদ্ধ রাখতে পারি? তাইতো তিনি যখন বিষয়গুলো অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বার্ষিক নির্জন ধ্যানের ট্রেনে করে কোলকাতা থেকে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন তখন যাত্রা পথে নতুন আরেকটি আহ্বান উপলব্ধি করলেন। আর এই উপলব্ধি বা নতুন আহ্বান আবিষ্কারকে মাদারের জীবনে একটি আহ্বানের উপর আরেকটি নতুন আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। যিশু যে ভালোবাসার জন্য তৃষিত তা মাদারকে সর্বদা তাড়িত করেছিল। আর মাদারও প্রতিনিয়ত তাঁর ধ্যান প্রার্থনায় যিশুর তৃষ্ণা অন্তরে উপলব্ধি করতেন। তাইতো মাদার তেরেজা যিশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীনতম মানবের সেবায় নিবেদিত একটি সন্ন্যাস সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা 'মিশনারী অব চ্যারিটি' নামে পরিচিত।

আমাদের বিশ্ব নন্দিত মমতাময়ী মা তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ সেবার কাজ শুধু নির্দিষ্ট সীমা বা গণ্ডী অর্থাৎ নিজ ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ

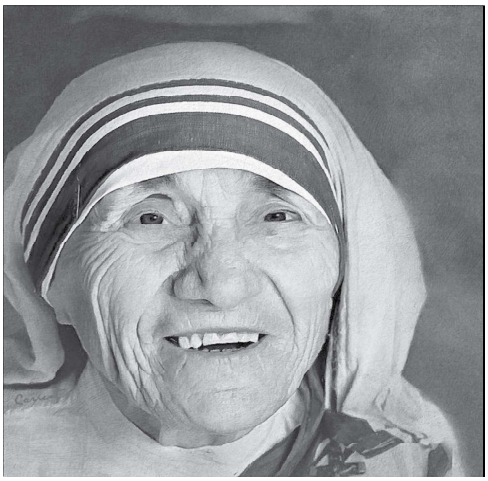

রাখেননি, তিনি তা সর্বজনে বিলিয়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, দৃশ্যমান মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়। তাই তিনি বলেছেন "তুমি দৃশ্যমান মানুষকে ভালোবাসতে না পারো, তবে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কি করে ভালোবাসবে?" প্রকৃত পক্ষেই তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে দৃশ্যমান গরীব, দুঃখী, অভাবী, বস্তিবাসী, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বিশেষ করে কুষ্ঠ রোগের মতো ছোঁয়াচে রোগীদের নিজ হাতে স্পর্শ করে সেবাদান করেছেন। যাদেরকে সমাজে হেয় চোখে দেখা হতো বা অবহেলা করা হতো তাদের তিনি কাছে টেনে নিয়েছেন। তিনি শুধু কথা বলেননি, কাজেও বাস্তবায়ন করেছেন। সেবার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ, বা জাতি কোনো কিছুতে তাঁর ভালোবাসা ও সেবা সীমাবদ্ধ রাখেননি। অকপটে তিনি তা সর্বজনে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সেবা জীবন যদি উপলব্ধি করি তাহলে দেখতে পাব যে, যখন তিনি রাস্তার পাশে পড়ে থাকা মুমূর্ষু রোগীকে বা পড়ে থাকা শিশুকে তুলে এনে সেবা ও আশ্রয় দিয়েছেন, সেখানে তিনি লোকটি বা শিশুটি কোন ধর্মের বা বর্ণের কিংবা কোন জাতির তা দেখেননি বা প্রশ্নও করেননি। তিনি শুধু তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে সেবা করেছেন। তিনি যে মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন বিশেষ করে অসহায়, দরিদ্র, অবহেলিত, অনাথ, অবাঞ্ছিত ও মরণাপন্ন শিশু, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং কুষ্ঠরোগীদের প্রতি তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসাপূর্ণ সেবা আমরা মাদারের জীবনে দেখতে পাই।

মাদার তেরেজা ছিলেন একজন সাহসী সেবিকা। তিনি মানুষের জীবনকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন এবং মূল্য দিতেন। যার প্রমাণ আমরা একটি ঘটনা দেখে বুঝতে পারি। ঘটনাটি হলো এই, একবার মাদার এবং অন্যান্য সিস্টারগণ কোনো এক জায়গায় যাওয়ার জন্য রেল স্টেশনে গেছেন ট্রেন ধরতে। সেখানে জনতার চিৎকার শুনে মাদার লক্ষ্য করলেন যে, ট্রেনের সামনে এক পাগল দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আসছে দেখেও পাগলটি ট্রেন লাইনটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে মাদার তেরেজা বিন্দুমাত্র নিজের জীবনের কথা না ভেবে পাগলটিকে দৌড়ে গিয়ে প্লাটফর্মে টেনে তুলে ধরলেন। লোকটি যদিও পাগল বা উন্মাদ ছিল তবুও মাদার পাগলটির জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। মাদার তেরেজা যে সত্যিকার অর্থেই একজন সাহসী মমতাময়ী মা ছিলেন তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

যে ভালোবাসে সে সেবা করে। কাউকে ভালোবাসতে হলে সেখানে স্বার্থত্যাগ অবশ্য নিহিত। কাউকে প্রকৃতভাবে যে ভালোবাসে সে তাকে সেবা করবে এবং সেবা করতে হলে সেখানে অবশ্যই স্বার্থত্যাগ না করে পারা যায় না। অর্থাৎ, নিজের ভালো লাগা বা পছন্দের কিছু বিষয়, নিজের মূল্যবান সময়, অর্থ প্রভৃতি বিষয় ত্যাগ করতে হয়। শিশু জন্ম দিতে গিয়ে একজন মা যেমন কষ্টভোগ করেন, তেমনি আমরা যদি কাউকে ভালোবাসতে চাই, তাহলে সেখানে স্বার্থত্যাগ না করে পারব না। কারণ প্রকৃত ভালোবাসা আমাকে/ আপনাকে কষ্ট দিবে এটা স্বাভাবিক। তাই তো মাদার তেরেজার জীবনে বিষয়টি উপলব্ধি করে বলেছেন, "সত্যিকারের ভালোবাসার অর্থ হলো যতক্ষণ তা কষ্ট না দেয় ততক্ষণ দেওয়া।" আর সত্যিকার অর্থেই আমরা মাদার তেরেজার জীবনে সত্যিকারের ভালোবাসার প্রমাণ পেয়েছি দরিদ্র, অভাবী, কুষ্ঠরোগীদের মতো লোকদের সেবাদানে। সেখানে তিনি সম্পূর্ণভাবে কষ্ট

হলেও নিজের জীবন আর্তমানবতার সেবায় বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে এই কষ্ট করতে পেরেছেন। যেখানে যিশু মানব জাতির জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে চরম ভালোবাসার প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টের এই চরম ভালোবাসা মাদার তেরেজা মর্মে মর্মে তাঁর অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি মানুষের মধ্যে যিশুকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন। যিশুকে আপন করে পাওয়ার তাগিদে বা চেষ্টায় রাস্তায় পড়ে থাকা অসহায় কুষ্ঠরোগী, বস্তির অলিতে গলিতে অভাবী, দরিদ্র মানুষের সেবায় ছুটেছেন। তিনি আবর্জনার স্তূপের মধ্যে খুঁজেছেন যিশু রূপী অসহায়, অনাথ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের। তাদের তিনি পরম মমতায় ভালোবেসেছেন, সেবাযত্ন এবং লালন-পালন করেছেন। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন যিশুর হৃদয় দিয়ে। তাই তিনি বলতেন, "কেবল সেবা নয়, মানুষকে দাও তোমার হৃদয়, হৃদয়হীন সেবা নয়, তারা চায় তোমার অন্তরের স্পর্শ"। উক্তিটি তিনি নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন সর্বান্তঃকরণে নিস্ব ও দরিদ্রদের উদারভাবে সেবার মধ্যদিয়ে।

তিনি সবসময় অন্তরে উপলব্ধি করেছেন যে, যিশু ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত। যিশুর এই তৃষ্ণা মাদার তেরেজা মানুষকে ভালোবাসাপূর্ণ সেবা কাজের মধ্য দিয়ে মিটিয়েছেন। তিনি অসহায়, অনাথ, অসুস্থ, পাপী যারা সমাজে ঘৃণিত তাদের ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে যিশুর তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। মাদার তেরেজা তাঁর সেবাকাজে মানুষকে দিয়েছেন তাঁর হৃদয়। কারণ তিনি যিশুর হৃদয় দিয়ে মানুষেকে সেবা করেছেন। যে হৃদয়ে ভালোবাসা ছিল পরিপূর্ণ। তাঁর সেবা জীবনে তিনি সবসময় উপলব্ধি করেছেন যে, মানুষ রুটি-ভাতের জন্যই কেবল ক্ষুধার্ত নয়, তারা ভালোবাসার জন্যও ক্ষুধার্ত। তাই তিনি সারাটা জীবন এই উপলব্ধি থেকেই ভালোবাসাপূর্ণ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিনিময়ে তিনি কোনো কিছুই প্রত্যাশা রাখেননি। অর্ঘ্যের মতো তিনি নিজেকে দরিদ্র-দুর্গত এবং মৃত্যুপথযাত্রীদের সেবায় ঢেলে দিয়ে খ্রিস্টের সান্নিধ্যে থেকেছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদার সেবাদানের মধ্যদিয়ে হয়েছেন তিনি বিশ্বমাতা বা সর্বজনের মমতাময়ী 'মা'।

বর্তমান বিশ্ব আজ ভালোবাসার অভাব অনুভব করছে। ধনী-গরীব, পাপী-তাপী সবাই আজ ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত। ভালোবাসার অভাবে সিরিয়া, প্যালোস্টাইন, আফগানিস্থান দেশের মানুষগুলোর মতো বিশ্বের অনেক দেশের মানুষ রয়েছে, যারা আজ ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত। তাদের আজ বিশেষ প্রেমপূর্ণ সেবা প্রয়োজন। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে একটি আতঙ্কিত নাম করোনা ভাইরাস। এই মহামারীর ফলে বিশ্বের মানুষ আজ দিশেহারা। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের পাশে গিয়ে তাদের সেবা দেওয়া এবং যারা মহামারীর ফলে চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমাদের কতো না প্রয়োজন। এই ক্রান্তিকালেও অনেকেই রয়েছে যারা স্বার্থপরভাবে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের জন্য লোভ ও ভোগের বশবর্তী হয়ে দুঃসময়েও নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অথচ এই জীবন যুদ্ধে মানুষের আজ কতভাবে সাহায্য ও সহভাগিতার প্রয়োজন। সেখানে আমরা কি পারি না মাদার তেরেজার মতো নিঃস্বার্থভাবে ও উদারতা নিয়ে তাদের ভালোবেসে সেবা করতে? মনের মধ্যে উদ্যম ইচ্ছা থাকলে আমি/আপনি সকলেই ভালোবাসা নিয়ে সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। আমরা অনেকেই আজ দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের সেবা করি কিছু অর্থ কিংবা বস্তুগত কিছু জিনিস দিয়ে আমরা অনেক সময় কিছু দান করে থাকি। কিন্তু সেখানে কতোটুকু ভালোবাসা নিয়ে আমরা দান করছি, নাকি আমরা সেবা করতে গিয়ে সেখানে স্বার্থ খুঁজে থাকি? বিষয়টা নিয়ে আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করে দেখতে পারি। আবার আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা মানুষের দুঃসময়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই । কিন্তু আমরা অনেক সময় অর্থ কিংবা নিজের বস্তুগত কিছু জিনিসের অভাবে ইতঃস্ততবোধ করি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যারা দরিদ্র,বঞ্চিত এবং অভাবী, তারা শুধুমাত্র বস্তুগত জিনিসের জন্য দরিদ্র বা অভাবী নয়, তারা ভালোবাসাপূর্ণ সেবার জন্যও দরিদ্র এবং অভাবী হয়ে থাকে। মাদার তেরেজার এই বাণী আমাদের মনে রাখা উচিত, "তুমি যদি শত শত লোকের ক্ষুধা মিটাতে না পারো তাহলে শুধুমাত্র একজনকে খাওয়াও।" ঠিক মাদারের এই উক্তির মতো আমি ব্যক্তিগতভাবে বলব যে, আমাদের হয়তো অর্থের অভাব আছে কিংবা অভাব আছে কিছু বস্তুগত জিনিসেরও কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তো ভালোবাসা রয়েছে। বরং আমরা আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়েই দরিদ্র, বঞ্চিত ও অভাবী ভাই-বোনদের দুঃসময়ে তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে, সু-পরামর্শ দিয়ে,একটু হাসি দিয়ে এবং আমার/আপনার সামর্থ্যের মধ্যে যা আছে তা দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। মাদার তেরেজার সেবার মধ্যে যে সর্বজনীন ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল, তা আমরা উপরোক্ত আলোচনায় যে কয়েকটি সেবার কথা জেনেছি তা দেখে বলতে পারি যে, মাদার তেরেজার যে ভালোবাসা ও সেবার ব্রত ছিল তা সর্বজনে করে অনুপ্রাণিত। তাঁর যে বিনম্র, ভালোবাসাপূর্ণ সেবা এবং তাঁর মধ্যে যে সর্বজনীন ভালোবাসা ছিল তা আমরা বর্তমান তাঁর রেখে যাওয়া (এমসি) সিস্টারদের হাউজে বা গৃহে গেলে উপলব্ধি করতে পারি। সেখানে আমার পালকীয় অভিজ্ঞতার সময়ে দেখেছি যে, যারা অসুস্থ, কিংবা গুরুতরভাবে অসুস্থ রয়েছে বা প্রতিবন্ধী রয়েছে এবং সেখানে যে শিশুরা প্রতি শনিবারে খেতে আসে তাদের মধ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনেরাই বেশি। সেখানে সিস্টারগণ যে পরিমাণ ভালোবাসাপূর্ণ সেবা দেন এবং মায়ের মতো করে শিক্ষা প্রদান করেন তা নিজে অভিজ্ঞতা না করলে বুঝতে পারতাম না। অর্থাৎ মাদারের জীবনে ভালোবাসা ও সেবার যে ব্রত ছিল তা তিনি সর্বজনীনভাবে বা নিজের ধর্মীয় গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখেই, সম্পূর্ণভাবে তা দান করেছেন। যার ফলে তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ও উদারতার জন্য তিনি আজ বিশ্বমাতা। তাঁকে কোনো ধর্মের মানুষ চেনে না এমন মানুষ পাওয়া বিরল বলে আমি মনে করি। তাঁর ভালোবাসা ও প্রেমপূর্ণ সেবা মানুষের চোখে আড়াল হয়ে থাকে নি। বরং তা সর্বজনে অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে। সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব পালনের মধ্য দিয়ে প্রিয়জনেরা আসুন, আমরাও তাঁর ভালোবাসা ও সেবার ব্রতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার/আপনার প্রতিবেশী দরিদ্র ও অভাবী ভাই-বোনদের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ সেবার হাত বাড়িয়ে দিই। আমরা যদি ভালোবাসা ও সেবা থেকে নিজেদের দূরে রেখে দিই এবং ভবিষ্যতে করবো বলে চিন্তা করে রেখে দিয়েছি, তাহলে আসুন মাদার তেরেজার অমৃত বাণীর মতো নিজেদেরকে বলি, "গতকাল চলে গেছে, আগামীকাল এখনো আসেনি, আমার /আপনার জন্য আছে আজকের দিন, এখনই ভালোবাসা ও সেবার কাজ শুরু করা যাক।"

তাই মাদার তেরেজার এই পর্ব পালনের দিনে তাঁর মধ্যস্থতায় মঙ্গলময় পিতার কাছে প্রার্থনা করি, যিনি ভালোবাসার উৎস পিতা পরমেশ্বর তিনি যেন আমাদের অন্তরেও মাদার তেরেজার সেই উদার ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তুলেন।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার-**

১. প্রতিবেশী (জগৎ মাতা সাধ্বী মাদার তেরেজা - সুনীল পেরেরা, সংখ্যা:৩২, বর্ষ:৭৬; ২০১৬ খ্রি:)

২. প্রতিবেশী (প্রেমের বান,নিত্য প্রবাহমান-ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, সংখ্যা: ৩৩, বর্ষ:৭৬; ২০১৬ খ্রি:)॥

# মুশুরীখোলা ও কিছু খ্রিস্টীয় আদি ভূমি এবং সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ

ড. ইসিদোর গমেজ

মেঘুলা-মালিকান্দা-অরিকুল-লরিকুল-নারিশা- এই নামগুলোর মত মুশুরীখোলা নামটিও ছোটবেলা থেকে দাদা-দাদী, নানা-নানিদের মত মুরুব্বীদের মুখে শুনেছিলাম। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, "আঠারগ্রাম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার"। উদ্দেশ্যগুলোর এক নম্বরে ছিল, "আঠারগ্রামের অতীত ঐতিহ্য অনুসন্ধান, উদ্‌ঘাটন, সংরক্ষণ ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান মূল্যায়নের লক্ষ্যে আঠারগ্রামের প্রতিটি পরিবারকেন্দ্রিক ব্যাপক জরিপ কর্ম পরিচালনা করা।" এই কর্মসূচীর অধীনে সামাজিক জরীপ করতে করতে প্রায় একুশ বছর আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বসত এলাকায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল "মালিকান্দা খ্রিস্টান কবরস্থান"। এখন প্রতিবছর সেখানে আঠারগ্রাম অঞ্চলের মানুষসহ অন্যান্য স্থানের কাথলিকগণও মৃতলোকদের স্মরণে সেই কবরস্থানের উন্মুক্ত মঞ্চে সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করছে। যদিও সেখানে আজ একটিও খ্রিস্টান পরিবার বাস করে না। অথচ উল্লিখিত এলাকাগুলোতেই ষোড়শ/সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী তথা কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বীজ রোপিত, অংকুরিত ও বিকাশ লাভ করেছিল।

পাঁচশত বছর আগের প্রাচীন সেই কাথলিক ধর্মবিশ্বাসী অধ্যুষিত জনপদের গ্রাম, নগর বা বন্দর বিলীন হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। কিছু কিছু এলাকা বা গ্রামের নাম পরিবর্তিত হয়ে অন্যকোন নাম ধারন করেছে। আবার কোথাও দেখা যায়, গ্রাম বা নগর আছে, কিন্তু সেখানে একটিও খ্রিস্টান ঘর-বাড়ী নেই। ১৬৭০-১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে, ভূষণা রাজ্যের ধর্মনগর ও তেলিহাটি, কোষাভাঙ্গা-লরিকুল-চন্ডীপুর গ্রামের নাম বাংলা ছাড়িয়ে আগ্রা, গোয়া, পর্তুগাল, এমনকি রোমেও তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসে উপেক্ষিত ধর্মনগর-তেলিহাটির সেই মহানায়ক ছিলেন, দোম আন্তনীয় দো রোজারিও। যিনি নাকি মাত্র দুই তিন বছরে ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানিয়েছিলেন। আর দোম আন্তনীর খ্রিস্টানরা ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা, ভাওয়াল, গোরাঘাট ও আসামের রাঙ্গামাটিসহ ৬০/৬৫টি গ্রামে বসবাস করত। ইতিহাস তা-ই বলে।

প্রায় তিন যুগ আগে যেরোম ডি' কস্তা, "বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী" শিরোনামে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার একটি পুস্তক প্রকাশ করে (আগস্ট, ১৯৮৮) বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে এক অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর লিখিত বইটি নিয়ে সুধী মহলে কোনদিন তেমন কোন আলোচনা সমালোচনা দেখতে পাইনি। তবে লক্ষ্যণীয় যে, গত কয়েকবছর যাবৎ বেশ কয়েকজন খ্রিস্টীয়সমাজ সচেতন ব্যক্তি বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস চর্চা করছেন এবং লিখছেন। যেরোম ডি' কস্তার বইটিতে তিনি কয়েকটি স্থানের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছেন, "এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন"। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস সংক্রান্ত আরও কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, ১। বঙ্গে খ্রিস্ট-মণ্ডলী- শ্রী মথুরানাথ নাথ (রচনা কাল- ১৮৯২; প্রকাশক বাংলাদেশ ব্যাপ্তিষ্ট সংঘ, ১৯৮৪ খ্রি:); ২। বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস-

*মুশুরীখোলা চরে ব্রাদার রোনাল্ড দ্রাহজাল, ড. যোসেফ ডি সিলভা, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস। সাথে স্থানীয় মাতব্বর*

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত (১৯৮৫ খ্রি:); ৩। বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়- লুইস প্রভাত সরকার (আগস্ট ২০০২ খ্রি:); ৪। তিনশো বছর আগে- জুলিয়ান এ. গোমেজ (১৯৬৬ খ্রি:); ৫। বাংলার চার্চের ইতিহাস- ডেনীস দিলীপ দত্ত (১৯৯২ খ্রি:); বইগুলো উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত বইগুলো পড়ে বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর গোড়াপত্তন ও অন্যান্য খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। তবে আরও গভীরতর ইতিহাস উন্মোচনের জন্য অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন নির্দেশ করে। আমি ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও দুই যুগ আগে উপলব্ধি করেছি এবং সময় সুযোগে বিশিষ্টজনদের সাথে সহভাগিতা করেছি। যা-ই হোক, আমি এখনও আশাবাদী কেউ না কেউ এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করে আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে। ইদানিং দোম আন্তনীয়কে নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। কেউ একজন বললেন, দোম আন্তনীও'র নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এটা যদি হয়, তবে অবশ্যই সুসংবাদ।

এবার ফিরে আসা যাক "মুশুরীখোলা" প্রসঙ্গে। কয়েকটি পুস্তকে মুশুরীখোলা নামের (গ্রামের) উল্লেখ আছে। কিন্তু কোথাও এই প্রাচীন খ্রিস্টান জনপদের বিস্তারিত তথ্য দেয়া নেই। আমি শুরুতেই বলেছি, ছোটবেলা থেকেই মুশুরীখোলা নামটি শুনে আসছিলাম। আমার পিতা মাইকেল মাষ্টারও বলতেন তুইতাল মিশনের কোন কোন বাড়ীর লোকেরা নাকি মুশুরীখোলা গ্রাম থেকে এসেছে।

মুশুরীখোলা গ্রামের সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন আমরা পূর্ব রাজাবাজার থাকতাম। একজন যুবক প্রাইভেট শিক্ষক আসতেন আমার মামাতো বোনকে পড়াতে। তার নাম এলবার্ট বিলাস বিশ্বাস। আমার বাবাও মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে এসে থাকতেন সেখানে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, অপরিচিত লোক পেলেই গল্প করতে করতে তার বাবা-দাদার নাম ঠিকানা বের করেন। এভাবেই তিনি আবিষ্কার করলেন আমাদের প্রাইভেট শিক্ষকের পিতার নাম শ্রী বিমল চন্দ্র বিশ্বাস, মুশুরীখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সেখানেই তাদের পৈত্রিক বাড়ী। আরও জানা গেল, শ্রী বিমল চন্দ্র বিশ্বাস, মি. ফিলিপ ডি' রোজারিও (সার্ভেয়ার পিডি রোজারিও নামে সমধিক পরিচিত, এসএমআরএ সিস্টার ছবি ও প্রীতির বাবা) এবং আমার পিতা মাইকেল গমেজ ১৯৩০ এর দশকে মুন্সিগঞ্জের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে গুরু ট্রেনিং (জিটি) করেছিলেন। এভাবেই শুরু আমার সাথে মুশুরীখোলার সম্পর্ক।

বিলাস এর সাথে আমি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যেদিন ওদের বাড়ীতে যাই তখনকার স্মৃতি আমি এখনও ভুলিনি। ঢাকা থেকে বাসে করে আমরা গাবতলী হয়ে হেমায়েতপুর স্টপেজে গিয়ে নামি। আমাদের সাথে আমার এক ভগ্নিপতি জেভিয়ার গমেজ (সাবু ভক্ত) ছিলেন। এখনকার হেমায়েতপুরের সাথে সে সময়ের হেমায়েতপুর আকাশ পাতাল তফাৎ। হেমায়েতপুর গ্রামের একটি নালা পেরিয়ে আমরা সোজা দক্ষিণে শাক-সব্‌জি ক্ষেতের আইল ধরে হেঁটে চললাম। চকের মাঝে একটি

বিরাট গাব গাছ, দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন বট গাছ। ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর মুশুরীখোলা গ্রামে শ্রী বিমল চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী পৌঁছাই।

অনেক গল্প শুনেছি বিলাসের বাবার কাছে। ধলেশ্বরী নদীর ভাঙ্গুণীর কবলে পড়ে বার বার তাদের জমি জমা হারাতে হয়েছে। ওদের সাথে আমরা দুপুরের আহার গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে দেখলাম দুইজন বিদেশী মহিলা ওদের বাড়ীতে উপস্থিত। বিশ্বাসদের বাড়ী সংলগ্ন একটি ছোট্ট ঘর। প্রতি শনিবারে তারা সেখানে থাকা ৪/৫টি খ্রিস্টান পরিবার পরিদর্শন করে প্রার্থনা করেন। যতদূর মনে পড়ে ঐ বিদেশিনীরা ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কোন প্রটেস্টান্ট মিশনের।

আমার সেই প্রথম মুশুরীখোলা দর্শন আমি কখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। বিলাস পড়াশুনা শেষে বিএড করে সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। বিয়ে করেন তুইতাল মিশনের একটি কাথলিক পরিবারে। দীর্ঘকাল তিনি তেজগাঁও সরকারী গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। ঢাকায় থেকেছেন ফার্মগেট এলাকায়। কয়েকমাস আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিলাস বিশ্বাসের সাথে আমার সবসময় যোগাযোগ ছিল। তার এবং তাদের পরিবারের একান্ত ইচ্ছা ছিল যেন ঢাকার কোন ধর্মীয় বা আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান মুশুরীখোলাতে কিছু একটা করে এবং আবারও একটি খ্রিস্টীয় সমাজ সংস্থাপিত হয়। আমিও কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটির মাধ্যমে মুশুরীখোলা এলাকায় একটি হাউজিং প্রজেক্ট নেয়ার প্রস্তাব করেছিলাম ১৯৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এতদ্উদ্দেশ্যে সেখানে বিলাসদের সহায়তায় কিছু জমির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সোসাইটির পক্ষ থেকে মি. উইলিয়াম গমেজ মি. নিকোলাস গমেজসহ কয়েকজনকে নিয়ে ঐ এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। তখন মুশুরীখোলা এলাকায় ২৬ শতাংশ জমির মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকার নীচে।

আমি একান্তভাবে চেয়েছিলাম, সেখানে কলকাতার আশে পাশে গড়ে ওঠা হবিবপুর, তাহেরপুর, কাউরাপুকুর ঠাকুরপুকুর, কল্যাণপুর, সোনারপুর মিশনগুলোর আদলে ঢাকা শহরের সন্নিকটে একটি আধুনিক আদর্শ ধর্মপল্লী গড়ে তুলতে।

১৯৯৮/৯৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে বারুইপুর ধর্মপ্রদেশ থেকে অবসরে যাওয়া বিশপ লিনুস গমেজ, এসজে ঢাকায় জেজুইট হাউসে আমাকে একদিন বললেন, ঢাকার কাছাকাছি তাঁদের স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করবেন। এজন্য তারা জমির সন্ধান করছেন। ভারত থেকে তাঁদের প্রভিন্সিয়াল এসেছেন। আমি তাদেরকে নিয়ে মুশুরীখোলা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। বিলাসদের পরিবারের সঙ্গে তাদের আলাপ আলোচনা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা মঠবাড়ী এলাকায় জমি কিনে সেখানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ব্রাদার রোনাল্ড দ্রাহোজাল সিএসসি আসক্তি পুনর্বাসন নিবাস (আপন) এর জন্য বড় জায়গা চাচ্ছিলেন। আমি তখন "আপন" জেনারেল বডি ও নির্বাহী কমিটির সদস্য। আমরা প্রথমে মঠবাড়ীর উলুখোলায় আপনের নামে ৪ বিঘার মত জমি ক্রয় করেছিলাম। উলুখোলা দ্রুত শিল্পাঞ্চলে পরিণত হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য খেলার মাঠ/পুকুর ইত্যাদির সীমিত সুযোগ থাকায় তিনি সে জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গার সন্ধান করতে থাকলেন। আমার মাথায় তো মুশুরীখোলা। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মাঝামাঝি ড. যোসেফ ডি' সিলভাসহ ব্রাদার রোনাল্ডকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে গেলাম মুশুরী খোলা। সেদিন বিশ্বাস পরিবারের বড় সন্তান মি. সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও তাদের বাড়িতে থিতু বিপুল চন্দ্র বিশ্বাসও ছিলেন। বিশ্বাস বাড়ীতে বসে অনেক কথা হলো, সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করে ব্রাদারের খুব পছন্দ হল। কিন্তু একসাথে ৬/৭ বিঘা জমি পাওয়া গেল না। তাছাড়া ইতিমধ্যে ঐ এলাকায় ২৬ শতাংশ জমির মূল্য বেড়ে হয়েছে ৬/৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং ব্রাদার রোনাল্ডের পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও মুশুরীখোলাতে কিছু করা সম্ভব হলো না। তবে পরে, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে আপন মুশুরীখোলা থেকে ৩/৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদী পার হয়ে সিংগাইর উপজেলায় একসাথে ৮/৯ পাখি জমি ক্রয় করেন। এখন সেখানে একাধিক স্থাপনা তৈরী করে "আপন" তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সিংগাইর উপজেলার প্রবেশ-মুখে বাস্তা বাজার সন্নিকটবর্তী জাইল্ল্যা গ্রামটি এখন "আপনগাঁও" নামে পরিচিত।

গত কয়েকমাস যাবৎ করোনাকালীন সময়ে কতগুলো বই পড়ে মুশুরীখোলা গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ইতিহাস জানবার চেষ্টা করেছি এবং বেশ কয়েকবার সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। যেরোম ডি' কস্তা মুশুরীখোলা সম্পর্কে ফুট-নোটে লিখেছেন "সাভার বাজার থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে পর্তুগীজ আমলের কাথলিক ছিলেন, কিন্তু নদীর ভাঙ্গনে জমিজমা হারিয়ে এদের কেউ কেউ তুইতাল অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে মুশুরীখোলায় মাত্র দু'টি ব্যাপ্তিষ্ট পরিবার আছে। মুশুরীখোলার কাছে "ফিরিঙ্গীকান্দা" নামেও একটি স্থান আছে, কিন্তু বর্তমানে সেখানে কোন খ্রিস্টান নেই। এ দু'টি এলাকার প্রাচীন খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন আছে।" যেরোম ডি' কস্তা যথার্থই বলেছেন। আমি জানি না, তিনি ঐ এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন কিনা। সেখানকার বর্তমান বাস্তবতা, ভৌগলিক অবস্থান, ধলেশ্বরী নদীর অতীত গতি-প্রকৃতি ও খ্রিস্টান জনপদের বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্য গবেষণার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "কথিত আছে, এ সময় (১৮৪৪ খ্রি:) ধলেশ্বরী নদীর অপর তীরে অবস্থিত মুশুরীখোলা নামক স্থান থেকে জনৈক যাজক এসে গোল্লা অঞ্চলের কাথলিকদের পরিচর্যা করতেন।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর উল্লিখিত তথ্যটির সত্যতা আছে। অর্থাৎ, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের আগে পরে মুশুরীখোলায় গির্জা বা ফাদারদের আবাসিক কেন্দ্র ছিল, পরবর্তীতে কাথলিক খ্রিস্টভক্তদের পরিবর্তে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলী স্থাপিত হয়। প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত তার, "বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস" বইএ লিখেছেন, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ডাঃ হেবার্লিন একজন লুথার্ন মিশনারী বেভারেন্ড রুপার্ট বিয়ন ও কার্ল সুপার নামে দুইজন সহকর্মী লইয়া ঢাকার অন্তর্গত দয়াপুর গ্রামে একটি মিশনকেন্দ্র খুলিলেন। তাঁহারা সুইজারল্যান্ডের একটি মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন।" শ্রী মথুরানাথ নাথ তাঁর "বঙ্গে খ্রিস্ট-মণ্ডলী" পুস্তকে দয়াপুর মণ্ডলীর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, দয়াপুর ও মুশুরীখোলা এক ও অভিন্ন। এর প্রমাণ পেয়েছিলাম ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে, যখন আমরা মুশুরীখোলাস্থ অরুণ দাস বাবুর বাড়ীতে যাই। বিলাসদের বাড়ীর পাশেই তার বাড়ী। অরুন বাবু ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে চাকুরী করতেন। সেই সংস্থার এসোসিয়েট ডিরেক্টর সাইমন পি. মুন্সির মাধ্যমেই প্রথম জানতে পারি যে, অরুন বাবুর কাছে মুশুরীখোলার পুরাতন গির্জা ঘরের একটি পাথরের ভিত্তি প্রস্তর আছে। অরুন বাবুর পরিবার সেই প্রস্তরখণ্ড সযত্নে সংরক্ষণ করছেন। ঐ প্রস্তরে উপরের অংশে দুই পাশে ক্রুশ চিহ্ন, শিরোনামে লিখা, "দয়া মন্দির ১৯২০, অধিকাংশ টাকা সদাশয় বন্ধুগণ ও স্থানীয় ভ্রাতৃগণ হইতে সংগৃহীত"। তাদের ভাষ্যমতে গির্জাঘরটি নির্মাণের কয়েক বছর পর ধলেশ্বরীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায়।

আমি বিভিন্নভাবে মুশুরীখোলা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাচীন ও বর্তমান ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। মেজর জেমস রেনেল এর ১৭৬৭-৭৭ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে ধলেস্বরীর গতিপথে মুশুরীখোলা এলাকার অবস্থানের সাথে বর্তমানের অনেক পার্থক্য। তখন ধলেশ্বরীর মূল স্রোত ফুলবাড়িয়া, সামপুর (শ্যামপুর), বাগুরতা (ভাকুর্তা-মুশুরীখোলা) 'র পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। একটি প্রবাহ মুশুরীখোলা-ভাকুর্তার দক্ষিণ পাশ ঘেষে পূর্ব দিকে গিয়ে তুরাগ নদীর সাথে মিশে বুড়িগঙ্গা নামে ঢাকা নগরীর প্রধান নদী হিসেবে প্রবাহিত হতো। ১৯১০-১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সার্ভেকৃত ঢাকা জেলা মানচিত্রেও মুশুরীখোলা বিশেষ স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তখনও মুশুরীখোলার বেশ দক্ষিণে এবং পশ্চিমে বেশ দূরে ধলেশ্বরীর অবস্থান ছিল। অর্থাৎ তখনও মুশুরীখোলা ভাঙ্গনের কবলে পড়ে নি। সুতরাং কখন মুশুরীখোলা, তথা দয়াপুর, নদীর ভাঙ্গনে পড়ে এটা গবেষণার মাধ্যমে বের করা কঠিন বিষয় নয়। (চলবে)

# পরলোকগত ফাদার জুলিও বেরুত্তি পিমে স্বর্গ থেকেও গরীবদের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধন করবেন

**ফাদার আর্তুরো স্পেজিয়ালে পিমে**

**ফা**দার জুলিও বেরুত্তির মৃত্যুতে বাংলাদেশ, বিশেষভাবে বৃহত্তর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ ও উত্তর বঙ্গের অনেক গরীব মানুষ দুঃখ করছে। কেন তা হয়? কারণ তাদের আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে ফাদার জুলিও অনেক সাধনা ও পরিশ্রম করেছিলেন। তাকে হারিয়ে অনেক সমিতি আর ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য-সদস্যাগণের বিশেষ ক্ষতি হয়ে গেলো ।

করোনা ভাইরাসের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে ১১ আগস্ট, মধ্য রাত্রে, ঢাকায়। তার বয়স ছিল ৭৭ বছর। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয় তখনকার বড় বড় কলকারখানার কেন্দ্র বুস্তো আর্সিজিও শহরে। তথাপি তিনি ধনী পরিবারের সন্তান নন। তিনি কলেজ পর্যন্ত বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করেছেন; তারপর মন্‌জা সেমিনারীতে ১ বছর বিশেষ দর্শনতত্ত্ব অধ্যয়ন করার পরে এক বছর ধরে আধ্যাত্মিক সাধনা (নভিসিয়েট) করেছেন। তিনি ছিলেন আমার ক্লাস মেইড। নভিসিয়েট ছিল গ্রামাঞ্চলের অন্য পরিবেশে, যেখানে আমরা ধ্যান-প্রার্থনা, খ্রিস্টমণ্ডলী ও পিমে সম্প্রদায়ের ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস এবং মাঠে বা খামারে কাজ করার উৎসাহ জাগতো। পরে ফাদার জুলিও মিলানে ঐশতত্ত্ব (Theology) পড়তে লাগলেন। আমি USA গিয়ে একই বিষয় পড়ি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাজক অভিষেক লাভ করেছেন। দুই বছর পরে ফাদার জুলিও বাংলাদেশে এসেছেন (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে)। ঐ সময় বাংলাদেশের অবস্থা খুবই শোচনীয়: মাত্র যুদ্ধ অবসান হয়েছে ব'লে, চারিদিকে ধ্বংস স্তুপ, মানুষের অভাব প্রচুর, অসংখ্য প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণে অনেকের প্রচণ্ড দুঃখ-বেদনা। বরিশালে গিয়ে বাংলা ভাষা শেখার পরে ফাদার জুলিও বেরুত্তি পালকীয় ও সামাজিক কাজে সেবা দিতে শুরু করেন। তিনি যে সকল স্থানে সেবা দিয়েছিলেন সেগুলো হলো;

মারিয়ামপুর ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল-পুরোহিত হিসেবে ১৯৭৩-১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ; একই স্থানে পাল পুরোহিত রূপে ১৯৭৪-৭৯ খ্রিস্টাব্দ; বাংলাদেশ পিমের রিজিওনাল প্রধান পরিচালক ১৯৭৯-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ দিনাজপুরে; সুইহারী নভারা টেকনিক্যাল স্কুলের পরিচালক ছিলেন ১৯৮২-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ; নিজপাড়া ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ১৯৮৪-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ; নিজপাড়ার উপকেন্দ্র সিংড়ার উন্নয়ন কাজ ও নতুন ধারা পরিকল্পনা: আধ্যাত্মিক সাধনা কেন্দ্র; পাথরঘাটা ধর্মপল্লীতে সহকারী পুরোহিত ১৯৯৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ; সিংড়া:অধ্যাত্ম সাধনা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ; সুইহারী নভারা টেকনিক্যাল স্কুলের

ও বোর্ডিংয়ের পরিচালক এবং পিমে হাউস রেক্টর ১৯৯৯-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ; দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ক্রেডিট ইউনিয়নের পরিচালক এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের কয়েকটি ধর্মপল্লীর ক্রেডিট ইউনিয়নে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে; দিনাজপুর সেন্ট ভিন্সেন্ট হাসপাতালের ডাইরেক্টর ২০০৩-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ; দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের আর্থিক সমন্বয়কারী ২০১৫-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এবং মারীয়ামপুর ধর্মপল্লীর কিদিরপুর উপকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোহিত জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

### গরীব, অসহায় আদিবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথে ফাদার জুলিওর টান

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ইউনুসের সময়ের চেয়ে অনেক আগে ফাদার জুলিও অনেক গরীবদের *"গ্রামীণ ব্যাংক"*, অর্থাৎ গরীবদের জন্যে সমিতি ও ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছেন। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তগণের অধিকাংশ আদিবাসী; রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টানদের মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া দুটি ধর্মপ্রদেশে আরও অনেকে আছেন যারা খ্রিস্টান নন, যার ফলে গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ ও জাতি সংমিশ্রিত হয়ে একসাথে থাকে। যখন কোন ক্রেডিট ইউনিয়ন সকলের মঙ্গল ও আশীর্বাদের জন্যে করা হয়, তখন যারা খ্রিস্টান নয়, কিন্তু যারা সৎ, তাদেরও ক্রেডিট ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এই *"গ্রাম্য ব্যাংক"* এর কাজে ফাদার জুলিও বেরুত্তি বিশেষ ক'রে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জড়িত হয়ে পড়লেন। কেননা সেই বছরে দিনাজপুরের বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সারা ধর্মপ্রদেশের ক্রেডিট ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতির *"মনিটর"* বা সমন্বয়কারী হিসাবে তাকে মনোনীত করেছিলেন।

পিমে মিশনারীগণ অনেক আগে থেকেই সঞ্চয় সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেমন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ফাদার যোসেফ মাক্কি পিমে চাউলের সঞ্চয় করা এক রকম গ্রামীণ ব্যাংক শুরু করলেন। যাতে দুর্যোগের সময় (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তুফান বা অনাবৃষ্টি) গরীব মানুষ কড়া সুদ থেকে মুক্তি পেতে পারে। পরবর্তী কালে ফাদার মাক্কি টাকা তহবিল দিয়ে সঞ্চয় সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়নে পরিণত করলেন। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সঞ্চয় সমিতি শুরু করা হয়েছে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, মোটামুটি চলতো এবং সময়ের পরিক্রমায় ক্রেডিট ইউনিয়ন নিয়ম অনুযায়ী উত্তীর্ণ হয়েছে। কোন কোন মিশনারী এই ক্ষেত্রে ততটা অভিজ্ঞ ছিলেন না এবং খ্রিস্টভক্তগণ যারা এই কাজের পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, সবাই যে নিঃস্বার্থভাবে এই সেবা কাজ করতেন, এমন কথা নয়, অথবা তারা ক্রেডিটের নিয়ম পালন করতেন না ব'লে বিশপ থিওটোনিয়াস একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা সমন্বয়কারী হিসেবে ফাদার বেরুত্তিকে বেছে নিয়েছেন।

অনেক সময় আমি ফাদার জুলিওর মুখ থেকে শুনেছি যে, ইতালিতে সব চেয়ে উন্নত অঞ্চল ছিল এবং এখনও আছে লম্বার্ডি মিলানসহ (পিতমন্ট অঞ্চলের তরিনো শহর)। তা আর্থিকভাবে সবচেয়ে উন্নত হয়েছে কি ভাবে? কারণটা হল যে, অস্ট্রিয়ার সরকার ঐ এলাকায় সঞ্চয় ব্যাংক এর ব্যবস্থা করেছে লর্ম্বাডি অঞ্চলে এবং উত্তর ইতালিতেও। ফাদার জুলিও বলতেন: "গরীবদের একটি প্রবণতা হলো এই, ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে লোন নিয়ে তাদের পারিবারিক সমস্যা সমাধান করা, যেমন বিয়ের খরচা, মৃতদের শ্রাদ্ধের খরচা, ইত্যাদি। বিয়ের অনর্থক খরচার জন্যে কেউ ঋণগ্রস্ত হলে তারা আরও অভাবগ্রস্ত হবে। আসলে ঋণ বা লোন নিতে হয় কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, যেমন জমির চাষ বা ক্রয় করার জন্যে, ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য, ঘর ঠিক করার জন্য ইত্যাদি। যার ফলে ফাদার জুলিওকে ক্রেডিট ইউনিয়ন বাঁচাবার জন্য কড়া নিয়ম চালু করতে হয়েছে, যেন লোন নিতে পারে শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য। সেইভাবে ফাদার দিনাজপুর (রাজশাহী) ধর্মপ্রদেশে প্রত্যেকটি ক্রেডিট ইউনিয়নে বড় মূলধন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে ।

পাউলুস হাঁসদা, যিনি ফাদার জুলিও বেরুত্তির সাথে সমিতি ও ক্রেডিট ইউনিয়নে ২২ বছর ধরে কাজ করেছেন, বলেছেন "ফাদার জুলিও কড়া নীতিবান পিমে মিশনারী ছিলেন। আদিবাসীদের সঞ্চয় করার মনোভাব ছিল না ব'লে ফাদার তাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে সেমিনার ও সভা আয়োজন করতেন। তার কথা প্রিয় বা অপ্রিয়, তার কিছু যায় আসতো না। যে সময় তিনি পাথরঘাটা মিশনে পালক পুরোহিত ছিলেন। হেঁটে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে ক্রেডিট ইউনিয়নের গুরুত্ব ও তার উপকারিতা ব্যক্তিগতভাবে বোঝাতেন। ক্রেডিট ইউনিয়ন ও সমিতির কাজে তিনি অনেক সহযোগীদের জড়িত করতেন এবং কিভাবে মানুষকে এই কাজে সচেতন করার দরকার ছিল ব'লে, তিনি এই বিষয় নিয়ে একটি বই লিখে তা কিনতে তাদের বাধ্য করাতেন। ফাদার নিজেও বসতেন শিক্ষার্থীদের সাথে। তিনিও সেমিনার পরিচালকদের কাছে প্রশ্ন করতেন।" তারা সে বই ক্রেডিট ইউনিয়ন সেমিনারের জন্যে ছিল মূল পত্তন।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ বর্তমানে ক্রেডিট ইউনিয়ন নিয়ে একই নিয়ম প্রয়োগ করে, একই বই ব্যবহার করে। সে বইয়ের মধ্যে কৃষকদের বিষয়ের শিক্ষাও আছে, যাতে তারা আধুনিক পন্থায় জমি চাষ করতে পারে, সেই কথা লিখলেন মাষ্টার পাউলুস হাঁসদা, যত ক্রেডিট ইউনিয়ন ছিল দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে, তত সুন্দর আর নিয়ম মাফিক চালানোর জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করতেন। পাউলুস হাসদা বলেন: "তাছাড়া তিনি নিজে ২২টি ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেকবার তিনি বিচার সালিশে বসতেন এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতেন। তার কথা সবাই মেনে নিত, কারণ তিনি যিশুর শিষ্য হয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতেন, যাজক হয়ে তিনি প্রত্যেক দিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন, ধ্যান-প্রার্থনা করতেন। সকলের কাছে তিনি ছিলেন সুনামধন্য। তাকে হারানোটা আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, কারণ সঞ্চয় সমিতি আর ক্রেডিট ইউনিয়ন চালাবার আর রক্ষা করার চেতনা বাড়িয়ে তোলার জন্যে তার মত এমন একজন মানুষ আর পাওয়া যাবে না। তার অবদানের কথা অনেকে স্মরণ করবে।"

বৃহত্তর দিনাজপুর (রাজশাহী সহ) কয়েকটি সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সব কটা নিয়ম নীতি অনুসারে চলত না, যার ফলে অনেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফাদার জুলিও এর দ্বারা, আবার কেউ সাদরে নতুন ধারা গ্রহণ করত, কিন্তু কেউ তা পছন্দ করত না। তবুও ফাদার জুলিও পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নন, তিনি ক্রেডিট পন্থা অনুযায়ী সবকিছু নবীকরণ করেছেন এবং পরিশেষে তিনি সাফল্যমন্ডিত হয়েছেন।

**সেন্ট ভিন্সেন্ট হাসপাতাল ডাইরেক্টর ফাদার জুলিও**

ফাদার জুলিও বেরুত্তি ২০০৩ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্ট ভিন্সেন্ট হাসপাতালের ডাইরেক্টর ছিলেন। অসম্পূর্ণ এই হাসপাতালের যাতে উন্নতি হয়, তিনি চেষ্টা করেন। স্কুল অফ নার্সিং ছিল না ব'লে, তিনি হাসপাতালের একপাশে দুইটি বড় হলঘর এবং নার্সদের হোস্টেল নির্মাণ করলেন, ইত্যাদি। তারপর তিনি নার্সিং স্কুল খুললেন, যেভাবে অন্য হাসপাতাল করে। এই প্রকল্পের ফলে অনেক দরিদ্র আদিবাসী মেয়ে এই স্কুলে ট্রেনিং নিতে পেরেছেন আর বর্তমানেও পারেন। ফলে তারা একই হাসপাতালে বা অন্য হাসপাতালে সহজে চাকরি পেতে পারেন। রোগীদের চিকিৎসার জন্যে ফাদার জুলিও আরও উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা করেছেন। আরেকটি বড় উপকার করলেন তিনি গরীব মানুষের স্বার্থে একটি Health Insurance ব্যবস্থা করেছেন। সেন্ট ভিন্সেন্ট হাসপাতালের সদস্য বা সদস্যার এই ইন্সুরেন্সে থাকলে, যখন কেউ অসুস্থ হয়, তার চিকিৎসার খরচার জন্যে তার নিজের একটি তহবিল রাখা আছে আর অন্যান্য খরচার জন্য কিছু কিছু কমানো হয়। বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু বলেছেন: "ফাদার জুলিও গরীব আদিবাসী ও বাঙালীদের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা উন্নত করার জন্যে চিন্তা করতেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মিশনারী, তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।"

তা ছাড়া কোন বিশেষ রোগের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তারদের হাসপাতালে আসার জন্যে ব্যবস্থা করতেন। তারা জটিল অস্ত্রোপচার করতেন। তাছাড়া ধানঝুড়ির কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতালে কিছু কিছু অবদান রেখেছেন তার সেবা ও সুন্দর পরিচালনার ফলে, যদিও তিনি সেখানে অল্প মেয়াদি কাজ করেছেন।

বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু মরিয়মপুর ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র কিদিরপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে ফাদার জুলিওকে নিযুক্ত করেছিলেন। সম্ভবত বিশপের উদ্দেশ্য ছিল: যে কোন উপায়ে হোক না কেন, ফাদার জুলিও বেরুত্তি পিমে, সাবসেন্টারকে একদিন ক'রে তুলবেন পূর্ণ একটি ধর্মপল্লী। সেখানে গিয়ে ফাদার জুলিও সাথে সাথেই হাল ধরলেন, মনুষ্য জাতির মধ্যে থাকতে গেলেন, ভীড়ের মধ্যেও ব্যক্তি নির্বিশেষে তিনি মঙ্গলসমাচার প্রচারিত হোক, তার একান্ত ইচ্ছা; যিশুর সেবা ও ভালোবাসা বিস্তারিত হোক "হায়রে! সেই কিদিরপুর হয়ে উঠেছে তার সমাধিস্থান, সেখানে তার যাওয়ার পরে, তিনি করোনা ভাইরাসে অসুস্থ হয়ে ঢাকায় মৃত্যু বরণ করলেন ১১ আগস্ট মধ্য রাতে। যেখানে মাত্র ২ মাস ছিলেন, তবুও তিনি স্বর্গ থেকে সকল আদিবাসীর দিকে তাকিয়ে থাকুন এবং সকলের জন্যে তিনি প্রার্থনা করতে থাকুন; যেন ঈশ্বর তাদের আধ্যাত্মিক বা জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে সবাইকে পরিতৃপ্ত করেন।

ফাদার জুলিও যদিও আমার ক্লাস মেইট, কিন্তু তবুও তার সাথে বেশি সময় ছিলাম এবং যেখানে তিনি পালকীয় ও সামাজিক কাজ করেছেন, সেখানে আমি ছিলাম না ব'লে আমার আশ্চর্য লাগে যে, তিনি এত সুন্দর কাজ করেছেন এবং এত যশ অর্জন করেছেন! তবুও তিনি আমাদের পূর্ব মিশনারীদের মত, তারা নীরবে মহাকীর্তি সাধন করেছেন, কেবল বাংলাদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও। তারা সাধু পলের এই বাণী সবসময় স্মরণ করতেন এবং আমাদের, তাদের শিষ্যদের, স্মরণ করিয়ে দিতেন: "তোমাকে অসাধারণ মানুষ কে-ই বা করেছে, বন্ধু? তোমার মধ্যে এমন কী-ই বা আছে, যা তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওনি? আর যদি পেয়েই থাক, তবে কেনই বা এমন গর্ব কর যেন ঈশ্বরের দানস্বরূপ তুমি তা পাওনি?" (১ম করি. ৪:৭)॥

# জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় আমার দায়িত্ব

**ড. আরোক টপ্য**

মানুষের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড যেমন- অপরিকল্পিত কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো নির্মাণের এবং বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবী নামক গ্রহটির আমরা যে ক্ষতিসাধন করেছি, তার জন্য প্রত্যেকের অনুতাপ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাট্রিয়ার্ক বার্থালোমিও জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন, "আমরা সবাই যেহেতু পরিবেশের কমবেশি ক্ষতিসাধন করেছি, সেহেতু আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, "কম হোক বা বেশি হোক, সৃষ্টিকে বিকৃত বা বিনষ্ট করায় আমাদের ভূমিকা" অনস্বীকার্য। তিনি পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ভাবে ও সবিনয় আবেদনের সুরে সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমাদের পাপ স্বীকার করার আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন: "ঈশ্বরের সৃষ্টির জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার অপরাধে অপরাধী মানুষের জন্য; বিশ্বজগতের আবহাওয়া পরিবর্তন ক'রে, তার প্রাকৃতিক বনজঙ্গল ধ্বংস ক'রে, তার জলাভূমি ধ্বংস করার মাধ্যমে তার পবিত্রতা বিনষ্ট ক'রে অপরাধ করেছে যে মানুষ তার জন্যে; মানুষ যে পৃথিবীর জলাশয়, তার জমিজমা, তার বাতাস ও তার জীবন ধ্বংস করেছে - এ সবই পাপ"। কেননা "প্রাকৃতিক জগতের বিরুদ্ধে পাপ করার অর্থ আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে পাপ করা এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা" *[বিশ্বধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র তোমার প্রশংসা কীর্তিত হোক আমাদের সকলের অভিন্ন বসতবাটীর যত্ন-পৃষ্ঠা ০৭]*। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের Laudato Si নামক সর্বজনীন পত্রটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই জন্য যে, এই মহান কাজটি না করলে আমাদের মতো অতিসাধারণ মানুষের পক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের এই প্রাবক্তিক নির্দেশনা উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না।

পোপ মহোদয়ের এই সর্বজনীন পত্রটি বারংবার পাঠ, বিভিন্ন ধরনের সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞজনের নিকট হতে সহভাগিতা শোনা এবং কারিতাস বাংলাদেশের একজন কর্মী হিসেবে প্রায়োগিক অবস্থান থেকে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার এই লেখার প্রয়াস।

Ecosystem বা বাস্তুতন্ত্র শব্দটির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। বাস্তুতন্ত্র হলো জৈব, অজৈব পদার্থ এবং বিভিন্ন জীবসমন্বিত এমন একটি প্রাকৃতিক একক সেখানে বিভিন্ন জীবসমষ্টি পরস্পরের সাথে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক জৈব ও অজৈব উপাদানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবনধারা গড়ে তোলে। আর ইকোসিস্টেম পরিসেবা হলো- প্রকৃতি (Nature) আমাদেরকে যে ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে। আমরা ইকোসিস্টেম থেকে বস্তুত, নিয়ামক, বিনোদন, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি পরিসেবা পেয়ে থাকি। ধারনা করা হয় যে, এই ইকোসিস্টেম যে সকল পরিসেবা প্রদান করে তার মূল্য প্রায় ১২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যদিও এই হিসেব দিয়ে সামগ্রিক মূল্য বোঝা যায় না কিন্তু এটা অনুমান করা যায় যে মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই ইকোসিস্টেমের পরিসেবার উপর।

অপরদিকে জীববৈচিত্র্য হলো জীবন্ত জীবের সমাহার যা বাস্তুতন্ত্রের কাজ এবং পরিসেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি এবং জলচক্র (Water Cycling), মাটির গঠন ও ধারণ, উদ্ভিদ পরাগায়ন, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, এবং কীটপতঙ্গ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। আনুমানিক ৫০,০০০-৭০,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি বিশ্বব্যাপি ঐতিহ্যগত এবং আধুনিক ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বছর প্রায় ১০০ মিলিয়ন মেট্রিকটন জলজ প্রাণী, যার মধ্যে মাছ, শামুক-ঝিনুক এবং কাকড়াজাতীয় প্রাণী রয়েছে যা প্রকৃতি থেকে নেওয়া হয় এবং বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বন্যপ্রাণীর মাংস অনেক দরিদ্র দেশে খাদ্য উৎস এবং জীবিকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া জীববৈচিত্র্যের এই ক্ষতি মানুষ এবং পরিবেশগত নিরাপত্তার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

কিন্তু উন্নতির এই চরম শিখরে এসে এই জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষা নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তা? কেন আজ বিশ্বব্যাপি আন্দোলন করতে হচ্ছে এই ধরিত্রীকে রক্ষার জন্য? পুণ্য পিতা পোপ মহোদয়কে বিশ্বনেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মাতৃসম আমাদের এই ধরিত্রীকে বাঁচানোর জন্য?

আমরা যদি এইসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাই তাহলে আমাদেরকে কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিতে হবে। এই পৃথিবী প্রকৃতির নিয়মেই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবী সৃষ্টি হতে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবন্ত বস্তুরও পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্ত হয় আবার নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। তাই বিলুপ্তি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। জীবাশ্ম রেকর্ড অনুযায়ী কোন প্রজাতি এখনও অমর প্রমাণিত হয়নি। ২-৪% প্রজাতি যা সৃষ্টি হতে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। বাকিরা বিলুপ্ত। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি এত দ্রুত ঘটছে যে তা অনুমানের চেয়ে ১,০০০ থেকে ১০,০০০ গুণ বেশী। বিলুপ্তির জন্য হুমকির সম্মুখীন প্রজাতির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৬,৯২৮ যার মধ্যে রয়েছে মেরু ভাল্লুক, জলহস্তি, হাঙ্গর, মিঠা পানির মাছ ইত্যাদি। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, গত ২৫ বছরে বিলুপ্তির হুমকিতে রয়েছে এমন প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৮,৪৬২ যা ১৯৯৬ সালে ছিল ৫,২০৫ টি *[আইইউসিএন]*। বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তির হুমকির প্রধান প্রধান কারণ হলো তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করা; অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহোরণ (বিভিন্ন বন্যপ্রাণী ও মাছ শিকার), উদ্ভিদ প্রজাতির আবাসস্থল ধ্বংস করে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ; পরিবেশ দূষণ; জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি।

আমরা যদি বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের যেসকল প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্তির হুমকির মধ্যে আছে তা খুঁজি তাহলে দেখতে পাই যে ৩৯ ধরনের স্তন্যপায়ী, ৩৮ ধরনের পাখি, ২৭ ধরনের সরীসৃপ, ৫৮ ধরনের মাছ এবং ৩১ ধরনের গাছ/লতাপাতা রয়েছে যা সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমাদের এই ভূ-খণ্ড থেকে হারিয়ে যাবে [IUCN REd List version 2021-1]।

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলো পরিবেশ দূষণ। দূষণের কারণ হলো আমাদের অসচেতনতা, প্লাষ্টিকের যত্রতত্র ব্যবহার, জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, জাহাজ ভাঙ্গার শিল্প থেকে নির্গত বর্জ্য ইত্যাদি পানি, মাটি ও বাতাসের সাথে মিশে প্রাকৃতিক এই উৎসকে দূষিত করছে।

পৃথিবীর অন্যতম ঘন বসতিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার বিশাল সংখ্যক লোকের খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। এর ফলে মাটি ও পানি দূষিত হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশের জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৮,০০০ টন যা ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮,০০০ টন এবং ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ৩৯,২৫ টন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে কীটনাশক কম ব্যবহারের প্রধান কারণ হলো মানুষ রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহারের পাশাপাশি

জৈব কীটনাশক ব্যবহার করছে [https://m.theindependentbd.com/printversion/details/130161]। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা ১৭তম। একই উৎসের তথ্য মতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতি হেক্টর জমিতে সার ব্যবহৃত হয়েছে ৩১৮.৫ কেজি যা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ছিল ১৪.৭ কেজি। এই রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে থাকা বন্ধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুজীব, প্রাকৃতির লাঙ্গল খ্যাত কেঁচো কৃষি জমিতে আর দেখা যায় না। ফলে ইকোসিস্টেমের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা যাচ্ছে যা প্রাকৃতিক খাদ্য শৃংখল বা Food Chain প্রভাবিত করছে যার কারণে অনেক প্রাণী আমাদের এই ভূখণ্ড থেকে হারিয়ে যাবে।

প্রকৃতিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট অবদান এই ধরিত্রীকে রক্ষার জন্য ভূমিকা রাখবে। কাথলিক চার্চের সামাজিক সংগঠন হিসেবে প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য কারিতাস বাংলাদেশ অনেক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- কারিতাস বাংলাদেশ তার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবেশ ও প্রতিবেশগত উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে স্থায়ীত্বশীল কৃষির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বাস্তুসংস্থান রক্ষা, স্থায়ীত্বশীল কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, এবং জীববৈচিত্র রক্ষা ও সংরক্ষণ;
- কারিতাস বাংলাদেশ তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তা হলো- ১. ক্ষুদ্র কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কৃষি খামার ও জীববৈচিত্র্যের সমন্বয় (সাফবিন); ২. স্থায়ীত্বশীল খাদ্য ও জীবিকায়ন নিরাপত্তা প্রকল্প (সুফল); ৩. দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশ কৃষি ও পানি দূষণ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি; ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কৃষি প্রতিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প; ৫. পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, স্বাস্থবিধি চর্চা ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুস্থ জীবন আনয়ন ও উন্নয়ন; ৬. বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকুলীয় এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি সহনশীল জীবিকার চর্চার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রয়াস); ৭. বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সবুজ জীবিকায়ন ও জীববৈচিত্র উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন; ৮. মংলা অঞ্চলের স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পানীয় জলের বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প; পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য নেতৃত্ব; ৯. স্থানীয় দরিদ্র পরিবারের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ। এই সকল প্রকল্প কারিতাস বাংলাদেশের ৭টি আঞ্চলিক অফিসের আওতায় ২৩ টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কারিতাস বাংলাদেশ এই সেক্টরের মাধ্যমে ১২১,৬৫৭ প্রত্যক্ষ উপকারভোগী এবং ১৭০,২০২ জন পরোক্ষ উপকারভোগীর নিকট বিভিন্ন ধরনের সেবা পৌঁছে দিচ্ছে;
- বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠি যেন টিকে থাকতে পারে তার জন্য স্থানীয়ভাবে অভিযোজনে সক্ষম কৃষি প্রযুক্তি যেমন- জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার; কেঁচো সার তৈরি, ব্যবহার ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা; আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন সহায়তা প্রদান; বাড়ীর আঙ্গিনায় বহুমূখী সব্জি চাষ; লবণ ও খরা সহিষ্ণু ধান, শাকসব্জি চাষের জন্য সহায়তা প্রদান; কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে;
- পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত এক বছরে কারিতাস বাংলাদেশ ২৯২,১২৩ টি বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বান্ধব ফলজ, বনজ ও ঔষধি জাতীয় চারা রোপন করেছে। আমারা আশা করছি চলতি বছরে আরও বেশী পরিমাণ গাছ লাগানো সম্ভব হবে।

প্রকৃতির এই জীববৈচিত্র্যকে রক্ষার জন্য আমরা একক ও সম্মিলিতভাবে যেসকল কাজ করতে পারি তা হলো-

১. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্লাষ্টিক বর্জন করতে পারি এবং কাপড় ও পাট দিয়ে তৈরি ব্যাগ ব্যবহার;
২. আমাদের বাড়ীর আশেপাশে যতটুকু জায়গা আছে তাতে বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো;
৩. জৈব কৃষির চর্চা যেমন-জৈব সার ও জৈব কীটনাশক, কেঁচোসার ইত্যাদির ব্যবহার করা;
৪. স্থানীয় জাতের বীজ সংরক্ষণ ও চাষ করা;
৫. ধর্মপল্লী পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জার্ম প্লাজম ব্যাংক (Germplasm Bank) বা বিভিন্ন ধরনের ফলজ/বনজ/ ঔষধি জাতীয় গাছ বা লতা লাগানো ও পরিচর্যার মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা;
৬. ছোটদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া;
৭. পরিবেশ রক্ষার জন্য যেসকল উদ্ভাবনমূলক যুগোপযোগী টেকসই প্রযুক্তি যেমন- কৃষিতে মালাচিং, জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার, প্রকৃতিনির্ভর সমাধান, সমন্বিত কৃষি চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও তা প্রয়োগ করা॥


## চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আমি স্বপ্না কস্তা তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পিপ্রাশৈর গ্রামের একজন দরিদ্র খ্রিস্টভক্ত। আমার **স্বামী প্রশান্ত কস্তা** গত ১৬ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সড়ক দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যা নিয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত পপুলার হাসপাতালে আই. সি. ইউ. তে ভর্তি হন। দশদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর বর্তমানে তিনি বাড়ীতে চিকিৎসাধীন আছেন। এ পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রায় ২৫০০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ব্যয় হয়েছে, যা বিভিন্ন মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে তার চিকিৎসা খরচ চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই তার চিকিৎসা খরচ চালিয়ে যাবার জন্য আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্য ও প্রার্থনা কামনা করছি।

**বিনীত প্রার্থনায়**

নাম : স্বপ্না কস্তা

গ্রাম : পিপ্রাশৈর

**সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা**

ডাচ্ বাংলা ব্যাংক হিসাব - ২৩৯১৫১৬৭৫৮১

বিকাশ : ০১৯১৪১৯০১৬৬

# মারুসিয়া : ভক্তের বিপদে ঈশ্বর প্রেরিত স্বর্গীয় মানবী

ফাদার সঞ্জয় ইগ্নাসিউস চিসিম (ফুলডা, জার্মানী থেকে)

ইউরোপের রাস্তায় প্রথমবারের ট্রেন জার্নির কথা কোনভাবেই ভোলার নয়। মনে থাকবে চিরদিন, যতদিন বেঁচে থাকবো। ভক্তের বিপদে ঈশ্বর যে বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে কাজ করেন, উদ্ধার করেন বিপদ থেকে, তার জীবন্ত উদাহরণ আমি। অপরিচিত, অজানা মানুষ এসে আমাকে উদ্ধার করেছেন। ভাষা, জাতি, বর্ণ, রং, ধর্ম- কোন কিছুই যে সেদিন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। ঈশ্বর আছেন, সর্বত্র বিরাজ করেন, ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দেন, উদ্ধার করেন ভক্তকে সকল বিপদ আপদ থেকে। সেদিনের রেল ভ্রমণ আমার জীবনের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

সেদিন ছিল জুলাই মাসের ১৫ তারিখ। পরদিন ১৬ জুলাই, সকাল এগারোটায় বেলজিয়ামের ল্যুবেন শহরে ব্রাবান্থহল নামক জায়গায় আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। যেতে হবে আমাকে জার্মানির ফুলডা থেকে বেলজিয়ামের ল্যুবেন শহরে। দূরত্বের দিক থেকে দু'টো শহরের ব্যবধান ৪৮০ কিলোমিটার। প্রায় এক সপ্তাহ আগেই ট্রেনের টিকিট বুক্ড করা আছে। আমার রেল ভ্রমনের সময় বিকাল ৪:৫০ মিনিটে, ফুলডা রেল স্টেশন থেকে। আমি সেভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। একেতো রেল ভ্রমন, ইউরোপের রাস্তায়, তার উপর প্রথমবার এবং সবচেয়ে মানসিক চাপের কারণ হলো একা একা ভ্রমণ করবো। সব মিলিয়ে ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম। সকালেই সব প্রস্তুতি সেরে রেখেছি যদিও বিকালে প্রায় ৫ টার দিকে ভ্রমণের সময় নির্ধারিত আছে। জানি না কিসের কারণে সকাল বেলাতেই সকল প্রস্তুতি সেরে রেখেছি, কাগজ পত্র প্রস্তত করে রেখেছি।

সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু বিকাল তিনটায় ব্রাসেলস থেকে আমার বন্ধু মি. ক্লেমেনস লাডেনবার্গার আমাকে ফোন করে জানালেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভ্রমণের নির্ধারিত সময়সূচি পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি পরামর্শ দিলেন যদি সম্ভব হয় ত্বরিৎ রওনা দিতে। কেননা, একটা ট্রেন ফুলডা থেকে ফ্রাংফুট যাবে বিকাল ৩:৪০ মিনিটে। এর পরে এদিনের জন্য আর কোন ট্রেন ঐদিকে যাবে না। আমার মাথায় বাজ পড়ে গেল। আমি কোনরকম দ্বিধা না করেই বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেহেতু আগে থেকেই প্রস্তুতি ছিল, তাই কোন বেগ পেতে হয়নি, কিংবা কোন রকম সময় ক্ষেপন করতে হয়নি। আমি যেখানে থাকি, সেখান থেকে রেল স্টেশন হাটা পথে প্রায় বিশ মিনিটের রাস্তা। বাংলাদেশের মত এই দেশে যত্রতত্র রিক্সা বা অটো নেই, কিংবা অন্য কোন যানবাহনও নেই। হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় এখানে নেই। অবশ্য যদি ব্যক্তিগত যান থাকে তবে সেটা ভিন্ন কথা। আমি কোনরকম দ্বিধা না করে ব্যাগ নিয়ে রওনা দিলাম। স্বাভাবিকের তুলনায় একটু জোরেই হাঁটছি। প্রায় ১৫ মিনিটেই স্টেশনে পৌছলাম। এখানকার রেল স্টেশনগুলোর কাঠামো অনেক পদ্ধতিগত। অনেক সুশৃঙ্খল। নতুনদের জন্য খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন, তবে সিস্টেম ফলো করলে কঠিন কোন ব্যাপার নয়। প্লাটফর্ম ৩ নম্বর খুঁজে পেতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হলাম যে এই প্লাটফর্ম থেকেই ট্রেন ফ্রাংফুটে যাবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই ট্রেন চলে এলো। ইন্টার সিটি এক্সপ্রেস (আইসিই)। প্রতি ঘন্টায় ট্রেনটি প্রায় ২৫০ কিমি বেগে চলে। উঠে পড়লাম। আসনও পেয়ে গেলাম।

ট্রেনটির শেষ গন্তব্য কিন্তু ফ্রাংফুট ছিল না; অর্থাৎ ফ্রাংকফুট রেখে ট্রেনটি আরও এগিয়ে যাবে আরও অন্য শহরে। ট্রেনের ভেতরে তাই সুখে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারছিনা। কারণ আমাকে নামতে হবে ফ্রাংফুট স্টেশনে। তাই সবসময় চোখ রাখছি কয়টা স্টেশন ছাড়ছে ট্রেনটি। অবশ্য ট্রেনের অন্য স্থানীয় যাত্রীরা খুবই সাহায্য পরায়ণ। জিজ্ঞেস করলে সঠিক তথ্য যোগান দিচ্ছে। কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করাটাই হল কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষই ইংরেজী বলতে পারে না। সবাই জার্মান ভাষায় কথা বলে। তবুও সঠিক তথ্য দেবার চেষ্টা তারা করেন আপ্রাণ। যাই হোক, ফ্রাংফুট স্টেশনে নামতে আমার কোন সমস্যা হয় নি। ফ্রাংফুট স্টেশনিট অনেক বড়। চারিদিকে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু, আপন জন প্রিয়জন ছাড়া কেউ কারো দিকে কোন ভ্রুক্ষেপও করেন না। যারা আমার মত একা, তারা তাদের স্মার্ট ফোন নিয়ে ব্যস্ত, নিশ্চয়ই পরের ট্রেন ধরার জন্য সময়সূচী খুঁজছেন কিংবা কখন কোন ট্রেন আসবে তার খবর পাওয়ার চেষ্টা করছেন। এখানকার একটা সুবিধা হলো সমগ্র ইউরোপের ট্রেন চলাচলের সময়সূচী জানার জন্য একটি অ্যাপ আছে, যেটা স্মার্টফোনে ডাউনলোড ও ইন্সটল করে অনায়াসে পেয়ে যেতে পারেন ট্রেন চলাচলের যাবতীয় তথ্য। কোন ট্রেন কয়টায় আসবে, কোন প্লাটফর্মে দাড়াবে, কতক্ষণ আগে আসবে কিংবা কতক্ষণ দেরী করবে। কোন ট্রেন সিডিউল বাতিল হলো কি না, এমন কি, এই অ্যাপ ব্যবহার করে আপনি অগ্রিম টিকিট বুকিং কিংবা বাতিল করতে পারবেন। এছাড়াও অনেক সুবিধা আছে এই অ্যাপের। তবে অ্যাপটির ব্যবহারে আপনাকে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। তা না হলে অ্যাপটি আপনার কোন কাজেই আসবে না। আমার মোবাইলেও আমি অ্যাপটি ডাউনলোড ও ইন্সটলড করে নিয়েছি। কিন্তু, যেহেতু ব্যবহারকারী হিসাবে আমি নতুন, তাই সহজে বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে কি করবো। কোন উপায় না পেয়ে অন্য যাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিতেই হচ্ছে। যাই হোক, এভাবে ফ্রাংকফুট থেকে কোলন মাসা/ডয়েচগামী ট্রেনে উঠতে সক্ষম হলাম।

ফুলডা থেকে ফ্রাংফুট, এবং ফ্রাংকফুট থেকে কোলন আসতে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। বিপত্তি শুরু হয় কোলনে আসার পর। নির্ধারিত সকল ট্রেন সূচী বাতিল করে দিচ্ছে ডয়েচ ট্রেন কর্তৃপক্ষ। কারণ, কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির কারণে ভয়াবহ বন্যা। কপালে চিন্তার ভাজ পড়ে গেল। আমার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন মি. ক্লেমেন্স, ব্রাসেলস থেকে। তিনি আমাকে সকল ধরণের গাইডলাইন্স পাঠাচ্ছিলেন। কোন ট্রেন ধরতে হবে, কত নম্বর প্লাটফর্মে যেতে হবে, কত সময় হাতে আছে, কয়টি স্টেশনের পর কোথায় নামতে হবে, এ ধরণের সকল ডিরেকশন তিনি আমাকে পাঠাচ্ছিলেন। তিনি বললেন সকল ধরণের ট্রেন চলাচল যেহেতু বাতিল হয়ে যাচ্ছে, তাই একটু অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে কোন ট্রেন কোলন থেকে আক্ষাণ যায় কিনা। আমাকে পরামর্শ দিলেন স্টেশনের স্ক্রিনে চোখ রাখতে, আর স্টেশনের ইনফর্মেশন ডেস্কে গিয়ে খোঁজ নিতে। আমি তাই করলাম। ইনফর্মেশন ডেস্কে গিয়ে খোঁজ নিলাম, তারা নিজেরাও জানে না, পরবর্তী কোন ট্রেন আছে কিনা যেটা যাবে আক্ষাণে। আক্ষান হলো বেলজিয়াম সীমান্তবর্তী জার্মানির শেষ শহর। ইনফর্মেশন ডেস্ক জানালেন অপেক্ষা করতে। ততক্ষণ বাজে সন্ধ্যা ৮ টা। রাত হয় নি, বেলা তখনও আছে। এই সামারে ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত সূর্যের আলো থাকে। তাই সেদিক থেকে কোন টেনশন নেই। টেনশন শুধু কাজ করছে যদি, কোন ট্রেন না চলে তাহলে কিভাবে বেলজিয়ামে পৌছবো।

প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ অপেক্ষা করছি। অবশেষে ট্রেনের স্ক্রিনে দেখা গেল আক্ষানের একটা ট্রেন আসছে। বিশ মিনিটের মধ্যেই স্টেশনে এসে পৌছবে। ইতিমধ্যে একজন স্থানীয় ভদ্রলোকের সাথে বেশ ভাব করে ফেলেছি। ভদ্রলোকটির নাম ম্যাথিও। তিনি এই কোলনেই কাজ করেন, বাড়ি তার ডুরেন শহরে। তিনিও এই একই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন। যাক বাবা। একজন সহযাত্রী পাওয়া গেল। জেনে নিলাম, আমার গন্তব্য আক্ষানের আগেই তার গন্তব্য। তবুও কোন সমস্যা নেই। অন্তত একজন সহযাত্রী পাওয়া গেল যার সাথে কথা বলে যাওয়া যাবে। ভদ্রলোকটি ইংরেজী ভালই বলতে পারেন এই হলো সাহস। ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এসে পৌছল। আমরা দু'জনে একই কেবিনে উঠলাম, বসলামও মুখোমুখি হয়ে। ট্রেনে বসে আমরা দু'জনে খুঁজতে লাগলাম, আক্ষাণ থেকে কোন ট্রেন লিউবেন (বেলজিয়ামে) যাবে কি না। তিনি তার অ্যাপে খুঁজে পেতে সাহায্য করছেন। কথা বলছি এমন সময় আমার চোখ গেল একই কেবিনে বসা অপরূপা সুন্দরী এক ললনার দিকে। দু'জনের মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু, কোন কথা হয় নি। এমনকি দ্বিতীয়বার তাকানোর মত সাহসও আর পাই নি। যাই হোক, সেদিকে আমার আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিও যায়নি। আমি টেনশনে আছি দেখে ম্যাথিও আমাকে সাহায্য করছিলেন আক্ষান থেকে কোন ট্রেন পাওয়া যায় কি না। কিন্তু, অ্যাপ অনুযায়ী, পূর্ব নির্ধারিত সকল ট্রেন চলাচল সূচী বাতিল দেখাচ্ছে। একটাই উপায় আক্ষানে পৌছলে পরে সেখানে অপেক্ষা করে, কিংবা ইনফর্মেশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে কোন ট্রেন পাওয়া যাবে কিনা।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মন খারাপ করে যখন বসে আছি তখন পাশে কাঁধের কাছে মেয়েলী সুরের কণ্ঠ: এক্সকিউজ মি। আমি মাথা তুলে তাকালাম, দেখলাম সেই মেয়েটি, যার দিকে একবার চোখ পড়ার পর দ্বিতীয়বার তাকানোর সাহস আর পাই নি। তিনি কাছে এসে বললেন: আমি দেখছি আপনি ভীষণ চিন্তিত। আমি আপনাদের কথপোকথন শুনেছি। আপনি আক্ষানে যাচ্ছেন, আমিও সেদিকেও যাচ্ছি। কিন্তু, এই মাত্র খবর পেলাম এই ট্রেনটি আক্ষান পর্যন্ত যাবে না। ডুরেনেই থেমে যাবে। আমি আমার বয় ফ্রেন্ডকে ফোন করে বলে দিয়েছি সে যেন আমাকে নিতে ডুরেনে আসে। আপনি যদি চান তাহলে আমার সঙ্গে আক্ষান পর্যন্ত যেতে পারেন।

পাশের সহযাত্রী ম্যাথিও সাথে সাথে সায় দিয়ে বললেন, তাহলে তো অনেক ভাল। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন মেয়েটির সঙ্গে যেতে। আমিও আর কোন উপায় না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। ট্রেন না পাই, তাতে কোন ক্ষতি নেই। অন্তত একজন সঙ্গী তো পেলাম। ট্রেন পাওয়া না গেলেও স্টেশনে বসে বসে রাত কাটানোর চেয়ে তার সঙ্গে যাওয়াটাই শ্রেয়। তাই কোন রকম দ্বিধা না করেই রাজী হয়ে গেলাম এবং ঠিক সেই সময়ে ট্রেনটিও থেমে গেল ডুরেন এ। ম্যাথিওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ট্রেন থেকে নেমে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দু'একটা কথা। তিনি নিজেই প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন: নাম তার মারুসিয়া। দেশ ব্রাজিল। ধর্ম: ইসলাম। আক্ষানে তিনি যাচ্ছেন তার বয় ফ্রেন্ড এর কাছে। সেই বয় ফ্রেন্ডই তাকে নিতে এই ডুরেন শহরে আসছেন। আমিও নিজের পরিচয় দিলাম। কথা বলতে বলতে স্টেশনের বাইরে চলে এলাম। বাইরে তখন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। সূর্যের আলোর কোন খবর নেই। যেন এক্ষুনি ঝোপ করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে মেলে ধরলো। ছাতার নিচে যেতে আমাকে অনুরোধ করলো। আমি নির্দ্বিধায় সায় দিলাম। একই ছাতার নিচে দু'জনে হেঁটে যাচ্ছি। আমার আসলে মাথায় তখন একটাই চিন্তা। এখন কি হবে? কিভাবে বেলজিয়ামে গিয়ে পৌছবো? সব ট্রেন সার্ভিস বন্ধ। বন্যার কারণে ট্রেনের সকল রাস্তা তলিয়ে গেছে। আমি ডুবে আছি সেই দুশ্চিন্তায়। পাশে অচেনা, অজানা একজন সুন্দরী অপরূপা আছে সেদিকে আমার যেন কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। মারুসিয়াও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন বোধ হয়। তাই আমাকে অভয় দিয়ে বললেন: এত টেনশন করছেন কেন? আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমাদের সাথে আগে আক্ষান পর্যন্ত চলুন, আমাদের বাসায় চলুন, সেখানে একটু বিশ্রাম করুন। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যদি আজ রাতের মধ্যে কোন ট্রেন পাওয়া না যায়, তবে কাল সকালে তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। এই রাতটুকু না হয় আমাদের সঙ্গেই থাকলেন। কোন সমস্যা আছে আপনার??? আমি সাথে সাথে মাথা নাড়িয়ে যতটুকু পারা যায় চোখে মুখে স্বস্তির ভাব নিয়ে বললাম: না না, আমার কোন সমস্যা নেই। বরং আপনি আমাকে অনেক বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কথা বলতে বলতেই দেখলাম তার বয় ফ্রেন্ড প্রাইভেট কার নিয়ে চলে এসেছে। আমার মনের ভেতরে তখন আর কোন ভয় নেই। বরং মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার ভরে গেছে। ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ জানালাম; কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করার চেষ্টা করলাম। মারুসিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর যে আমার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন, তিনি যে স্বয়ং উপস্থিত এই মারুসিয়ার রূপে, সেটা উপলব্ধি করে আমি মানসিকভাবে বলীয়ান হলাম। নির্ভর হলাম। শক্তি ফিরে পেলাম।

গাড়িতে বসে মারুসিয়ার বয় ফ্রেন্ডের সাথেও পরিচিত হলাম। দেখতে ভীষণ হ্যান্ডসাম। নাম তার ইয়াসা। পাশাপাশি দুজনকে বেশ মানিয়েছে। অতি বিনয়ী, ভদ্র, স্বল্পভাষী একটা যুবক। চোখে বিশাল বড় চশমা। অনেক কথা হলো গাড়িতে বসে। তাদের কাজ, তাদের বাড়ি, তাদের পরিচয় সব কিছু। আমিও নিজের পরিচয় দিলাম। আমার দেশ, আমার বর্তমান ঠিকানা, আমার যাজকীয় জীবন, বেলজিয়ামে আমার পড়াশুনা, জার্মানিতে আসার কারণ সব কিছু সংক্ষেপে বললাম। অবাক করা ব্যাপার তারা দু'জনেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, আমি একজন কাথলিক যাজক। তারপরেও আমাদের মাঝে হৃদ্যতার, আন্তরিকতার কোন কমতি ছিলনা। বরং তারা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নিল। তাদের ধর্ম ইসলাম হলেও কট্টরপন্থী মুসলিম তারা নয়। সকল ধর্মের প্রতি রয়েছে তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা। দীর্ঘ রাস্তা, প্রাইভেট কারে করে আক্ষানে পৌছতে প্রায় একঘন্টা লেগে গেলো। গাড়িতে বসে দেখছি প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে; অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে আমি ক্লেমেনসের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিলাম মারুসিয়াকে। আমার ফোন মারুসিয়াকে দিয়ে কথা বলিয়ে দিলাম ক্লেমেন্স এর সাথে। তারা দু'জনে জার্মান ভাষায় কথা বলেন, তাদের বাসার ঠিকানা দিলেন এবং জানালেন যে, ক্লেমেন্স ও ফ্রেডারিকা ইতোমধ্যে আক্ষানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন আমাকে নেওয়ার জন্য। তারা দু'জনে কথা বলা শেষ করার পর আমিও কথা বললাম ক্লেমেন্সের সাথে। তিনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, ফাদার সঞ্জয়, কোন চিন্তা করো না। তুমি খুব ভাল মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছ। তুমি নিশ্চিন্তে তার বাসায় যাও। তোমাদের পৌছার আধঘন্টার মধ্যেই আমরা ওখানে গিয়ে পৌছবো। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

রাত তখন ন'টা। তাদের বাসায় পৌছলাম। বাসা থেকে কয়েক মিনিটের হাটাপথের দূরত্বে গাড়ি পার্কিং করা হয়েছে। ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে তাদের বাসায় গিয়ে উঠলাম। আমাকে জল দিলেন, হালকা স্ন্যাক্স দিলেন, তারপর কফি দিলেন। সেগুলো ভোজন করে দেহে মনে আত্মায় যেন শক্তি ফিরে পেলাম। তাদের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। কে বলেছে পাশ্চাত্যের মানুষ যান্ত্রিক? কে বলেছে তাদের হৃদয়ে দয়া, প্রেম, মমত্ববোধ নেই? আমি তো দেখছি আমাদের অনেকের চেয়ে বেশিই

(১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত জীবন (সাধু আগষ্টিন)

**ব্রাদার ষ্টিফেন বিনয় গমেজ, সিএসসি**

সাধু পলের প্রথম জীবন সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত আছি। তাঁর নাম ছিল শৌল। তিনি খ্রিস্টানদের নির্যাতন ও হত্যা করতেন। কিন্তু দমেশকের পথে প্রভু যিশুর দর্শন পেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তার মন পরিবর্তন হয়েছে। তখন তার নাম দেওয়া হয় পল। এর পর তিনি আর পূর্বের জীবনে ফিরে যান নি। এমনভাবে জীবন যাপন করেছেন, যা তাকে একজন মহান সাধু করে তুলেছে। তিনি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, পিছনের দিকে আর কখনো ফিরে তাকন নি। এমনি কি প্রভু যিশুর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সাধু পলের সঙ্গে হিপ্পোর সাধু আগষ্টিনের জীবনের কিছুটা মিল রয়েছে। যুবক বয়সে তিনি এমন উশৃঙ্খল ও লাগামহীন জীবন যাপন করেন যে, মাত্র সতের বৎসর বয়সে আগষ্টিন একজন মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পরেন। ফলে তার একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। তিনি তার নাম রাখেন "ঈশ্বরের দান"। তাঁর মা স্বাধ্বী মণিকা ছেলে আগষ্টিনের মন পরিবর্তনের জন্য সবসময় প্রার্থনা করতেন। অবশেষে ৩৩ বৎসর বয়সে তার মন পরিবর্তন হয়। সাধু আগষ্টিন মন পরিবর্তন করেন কারণ, তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, একমাত্র যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমেই তিনি সত্য ও পরিত্রাণ লাভের পথ খুঁজে পেতে পারেন। এভাবে তিনি মন ও আত্মার শান্তি লাভ করেছিলেন ও সাধুতুল্য জীবন যাপন করেছিলেন।

মন পরিবর্তনের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং পূর্বের জীবনে আর ফিরে যান নি। দীক্ষাগ্রহণের পর পরই তাঁর মা ও সন্তান মৃত্যুবরণ করেন। তখন তিনি **তাগাসতে** প্রত্যাবর্তন করেন ও সেখানে তার শিষ্য ও নিজের জন্য একটি সন্ন্যাস-আশ্রম স্থাপন করেন। অতপর, সেখানেই তিনি প্রার্থনা, অধ্যয়ন ও সক্রিয় সেবাকাজের মধ্য দিয়ে প্রৈরিতিক দরিদ্রতার জীবন-যাপন করেন। তিন বৎসর পর ভক্তসাধারণের পিরাপিরিতে তাকে যাজকরূপে অভিষিক্ত করা হয়। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁকে হিপ্পো ধর্মপ্রদেশের বিশপরূপে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি ৩৪ বৎসর বিশপরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সন্ন্যাসজীবনের কুলপতি বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন একজন বিশপ, পাপস্বীকার শ্রোতা এবং মণ্ডলীর পিতৃগণের মধে অন্যতম। তিনি ছিলেন মণ্ডলীর আচার্য, একজন যুগান্তকারী দার্শনিক ও বিখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদ।

যুবাবয়সের নিজের ভুল-ভ্রান্তির কথা ভেবে তিনি সবসময় বিনম্র জীবন যাপন করেছেন। তাঁর প্রার্থনা ছিল, "হে প্রভু, আমার অন্তর গ্রহণ করো, কারণ আমি তা তোমাকে দিতে পারি না! আমার অন্তর তুমি সংরক্ষণ কর, কারণ আমি তা তোমার জন্য সংরক্ষণ করতে পারি না! আমার জন্য যেকোন ক্রুশ তুমি প্রেরণ কর যেন সে ক্রুশগুলো আমাকে তোমার ক্রুশের প্রতি অনুরক্ত থাকতে সাহায্য করে এবং স্বয়ং আমাকে (myself) রক্ষা করার চেয়ে আমাকে (me) রক্ষা কর! এই প্রার্থনা হতে তাঁর চরম বিনম্রতা প্রকাশ পায়।"

মানুষ যখন তার কৃত অন্যায় বুঝতে পারে ও হৃদয়-মন পরিবর্তন করে প্রভু যিশুর পথে ফিরে আসে তখন প্রভু যিশু তার জীবনে মূল্যবান অনেক কিছু ঘটতে দেন, যেমন দিয়েছিলেন সাধু আগষ্টিনের জীবনে। তিনি তাঁর মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনাসমূহ প্রস্ফুটিত করতে পেরেছিলেন যা উশৃঙ্খল ও বেপরোয়া জীবন-যাপন করতে থ াকলে সম্ভব হতো না। প্রতিটি মানুষের জীবনই মূল্যবান। তা উশৃঙ্খল ও লাগামহীণ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে নষ্টা করা চলে না।

সাধু আগষ্টিন সকল যুবাদের, বিশেষভাবে যে সকল যুবাগণ বর্তমানে উশৃঙ্খল ও লাগামহীন জীবন যাবন করছেন তাদের জন্য এক জ্বলন্ত আদর্শ। তাদের মন পরিবর্তনের সময় ফুরিয়ে যায় নি। এখনো মন পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। সাধু আগষ্টিনের আদর্শ অনুসরণ করে তারা এখনও মন পরিবর্তন করতে পারেন। তারা মন পরিবর্তন করে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হতে পারেন॥

## "নিঃস্বার্থ সেবাদানে বিশ্বজননী ...

(৫ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তি জীবনকে স্বার্থক করে তুলেছেন। মাদার তেরেজা নিজে কোলে তুলে নিয়েছেন অবাঞ্ছিত শিশুকে, রুগ্ন ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মাদার সবাইকে ভালবেসেছেন তার সৎকর্ম দ্বারা। তার নিঃস্বার্থ সৎকর্মের তথা দয়ার সেবা কাজের দৃষ্টান্ত দেখেই তাকে গোটা বিশ্ব " **বিশ্ব মাতা** " বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মাদার তেরেজা এক নামেই বিশ্ব যাকে চেনে ও জানে। তিনি আর্তমানবতার সেবায় কালজয়ী মা। জীবিতকালেই যিনি জীবন্ত সাধ্বী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি গতানুগতিক মাণ্ডলীক পালকীয় সেবা কাজের বাইরে গিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যিশুকে সেবা করতে চাইলেন। সম্পূর্ণ এক ব্যতিক্রমধর্মী, অত্যন্ত চ্যালেঞ্জপূর্ণ সেবা দায়িত্ব বেছে নিলেন। অবাঞ্ছিত পতিত পদদলিত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া মানুষদের কুড়িয়ে এনে তিনি হৃদয়ের ভালবাসায় তাদের অন্তরে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। যারা নিজেদেরকে অস্পৃশ্য, অসহায়, অবাঞ্ছিত ও ভালবাসার অযোগ্য বলে মনে করতেন মাদার তেরেজা তাদের ভালবেসে ভালবাসাময় করে তুলেছেন। সেজন্য তিনি বলেছেন,"**ভালবাসা ছোঁয়াচে।**"

তিনি তার সেবা কাজের জন্য অনেক বার পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে যখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অটোগ্রাফ নিতে চাইত তখন তিনি তাদের হাতে লিখে দিতেন: **"God bless you M. Teresa, M.C."**

"মাদার তেরেজা" যারা গরিব-অসহায় মানুষ তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন এবং প্রার্থনা করতেন সারা পৃথিবীর জন্য, অসহায়-গরিবেরা মাদার তেরেজা না থাকলেও তেরেজা যে সম্প্রদায় গড়ে রেখে গেছেন তাদের সান্নিধ্যে এখন সারা পৃথিবীতে তারা অকৃত্রিম সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, যে আদর্শ মাদার তেরেজা রেখে গেছেন সে আদর্শকে সামনে রেখে তার সম্প্রদায়গুলো নানাভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যা বর্তমান সময়ে আমরা দেখছি। সেবার ব্রত নিয়ে মাদার তেরেজা যে সেবা কাজ শুরু করেছিলেন তা তিনি পরম মমতার সহিত করেছেন আর ভালবাসার সহিত করেছেন তাঁর জন্যই তো মানুষের অন্তরে এখন ও তিনি আছেন যার ফলে সারা বিশ্বব্যাপি তিনি মাদার তেরেজা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. মাদার তেরেজার কথা। বাবু ফরিদী।

২. প্রতিবেশী ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যা:৩২॥

# ভালবাসার প্রতিদান

**পিয়াল লরেন্স গমেজ**

নিশিতার ফোনের শব্দে ইভান্সের ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিশিতা হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে ইভান্স কথা বলতে শুরু করে। নিশিতা ইভান্সের খুবই ভালো বন্ধু। বন্ধু হলেও তারা দুইজন একে অপরকে ভালবাসে। নিশিতা এবং ইভান্সের পরিচয় হয়, এক বন্ধুর জন্মদিন অনুষ্ঠানে। সেখানে ইভান্সের বন্ধু ঝলক, নিশিতার সাথে ইভান্সের পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম দেখাতেই নিশিতার প্রেমে পড়ে যায়। নিশিতার ক্ষেত্রেও তাই ঘটে কিন্তু লজ্জার কারণে কেউ কাউকে তা মুখ ফুটে বলতে পারে না। ইভান্স লক্ষ্য করল নিশিতা তার সাথে কোন কথাই বলে না তাই, ইভান্সই কথা বলতে শুরু করল। তারা দুইজন কথায় কথায় ভালবাসার গভীরে যেতে লাগল ঠিকই কিন্তু তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি। নিশিতা ইভান্সকে প্রশ্ন করল, "তুমি কোথায় পড়াশোনা কর?" তখন ইভান্স তাকে উত্তর দিল,"আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।" এটা জানতে পেরে নিশিতা খুবই আনন্দিত হয় তার কারণ হলো সেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কিন্তু ইভান্স নিশিতার এক ব্যাচ সিনিয়র। ইভান্স ২য় বর্ষে এবং নিশিতা ১ম বর্ষে। সেই পরিচয় থেকে তাদের ভালবাসা শুরু। বলতে গেলে তারা দু'জন ভালবাসার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। দুইজন একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। তারা এক সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় এবং এক সাথে ফিরে আসে হাতে হাত ধরে। নিশিতা যখন একটু দেরি করে তখন ইভান্স তার জন্য অপেক্ষা করে আর ইভান্সের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। কখনো কখনো এমনও ঘটে ইভান্স নিশিতাকে তার বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসে। নিশিতা যেন ইদানিং স্থির হয়ে থাকতে পারে না, সারাক্ষণ ইভান্সকে নিয়ে চিন্তা করে। যেখানেই যাক না কেন ইভান্সকেই শুধু দেখতে পায়। অন্য দিকে ইভান্সের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যেখানেই যাক না কেন শুধু নিশিতাকেই দেখতে পায়, কখনো আবার ইভান্স আয়নার মধ্যে নিশিতাকে দেখতে পায়। কিন্তু দুইজন যে একে অপরকে ভালবাসে সেটা মুখ ফুটে বলতে পারে না যে, "আমি তোমাকে ভালবসি, তুমি আমার জীবন, তুমি শুধুই আমার।" তার প্রধান কারণ হলো ভয়। নিশিতা মনে মনে চিন্তা করে তার মনের ভালবাসার কথা ইভান্সকে বলে দিলে সম্পর্কটা ভেঙ্গে যায়, অন্যদিকে ইভান্সও একি কথা চিন্তা করে। যার কারণে তারা দুই জন একে অপরকে তাদের অব্যক্ত প্রেমের কথা গুলি বলতে পারে না। তবে চোখে চোখ রেখে তাদের ভালোবাসার কথাগুলো প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে কখনো এমনও ঘটে যে ইভান্স নিশিতাকে একদিন দেখতে না পারলে তার কোন কিছুতেই ভালো লাগে না,পড়াশুনায় মন বসাতে পারে না। তখন তার কাছে একটি দিন হাজার দিনের মতো লাগে। নিশিতার ক্ষেত্রে একই কাহিনী। নিশিতা যদি ইভান্সকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হারিয়ে ফেলে তখন তার কাছে কয়েক সেকেন্ড হাজার ঘন্টার মতো মনে হয়। নিশিতা এবং ইভান্স ভালোবেসে মনের মধ্যে স্বপ্নের ভুবন ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে। এভাবেই নিশিতা এবং ইভান্সের দিন কাটতে থাকে। হঠাৎ একদিন নিশিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি তা দেখে ইভান্সের মনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে যে কেন সে আজ আসেনি। ইভান্স বাসায় গিয়ে ফোন করে কিন্তু নিশিতা রিসিপ করে না, ফেসবুকে মেসেজ পাঠালে রিপ্লাই পাওয়া যায় না তা দেখে ইভান্স মনে মনে চিন্তা করছে নিশিতা তো আগে এরকম করেনি তবে আজ কেন এরকম করছে। এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে ইভান্স দিশেহারা। এক পর্যায় ইভান্স ধৈর্য হারিয়ে বন্ধুর মাধ্যমে নিশিতার খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল নিশিতার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। এ খবর শুনে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সে দেরি না করে নিশিতার বাড়িতে ছুটে গেল। সেখানে তার অবস্থা দেখে ইভান্স কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। হঠাৎ করে নিশিতার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। নিশিতার শেষ মুর্হূতগুলি পর্যন্ত ইভান্স তার কাছেই ছিল। শেষে ইভান্স তার মনের অব্যক্ত ভালোবাসার কথা নিশিতার কাছে প্রকাশ করল। একটু মুচকি হেসে নিশিতা ও তার ভালোবাসার কথা ইভান্সের কাছে প্রকাশ করল। তখন ইভান্স নিশিতাকে প্রশ্ন করল, ভালোবাসার প্রতিদান কি এটাই ? তুমি আমাকে এ জগতে একা রেখে চলে গেলে তোমাকে ছাড়া আমি কি নিয়ে বাঁচব। পারব না তোমাকে ছাড়া বাঁচতে। নিশিতা কিছু না বলে ইভান্সের কোলে তার মাথাটা রাখলো। তারপর ইভান্সের হাতে হাত রেখে নিশিতা আস্তে করে ইভান্সের কানের কাছে গিয়ে "আই লাভ ইউ" বাক্যটা বলতে বলতে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। ইভান্স নিশিতার প্রাণহীন দেহ নিয়ে ভাবতে লাগল, সে এবং নিশিতা ভালোবেসে যে ভুবনটি গড়ে তুলেছিল তা ভেঙ্গে গেল। ইভান্স নিশিতার প্রাণহীন দেহটি জড়িয়ে ধরে শুধু বলতে লাগল ও love you নিশিতা ও love you.

## মারুসিয়া : ভক্তের বিপদে ঈশ্বর প্রেরিত স্বর্গীয় মানবী

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

আছে। একজন মেয়ে হয়ে ট্রেনের কেবিনে একজন অচেনা অজানা পুরুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া, নিজে থেকে এগিয়ে এসে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়া, নিজের বাসায় নিয়ে আসা- আমাদের দেশের কোন মেয়েতো দূরে থাক, কোন পুরুষের পক্ষেও কি সম্ভব? তাদের দু'জনের ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। দু'জনের বোঝাপড়া, দু'জনের মনের রসায়ন আমাকে মুগ্ধ করেছে। চা খেতে খেতে, গল্প করতে করতে কখন যে সময় পার হয়ে গিয়েছে, টেরই পাইনি। কলিং বেলের শব্দে সম্বিত ফিরে পাই নিজেকে। চলে এসেছে আমার আরেক উদ্ধারকর্তা। মি. ক্লেমেনস্ লাডেনবার্গার। দূর্যোগপূর্ণ রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে উদ্ধার করার জন্য সেই ব্রাসেল্স থেকে ছুটে এসেছেন স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে। তাদের সাথে চলে আসার আগে আমি মারুসিয়া ও ইসায়ার নাম্বার নিয়ে নিলাম। স্মৃতিটাকে চির জাগরিত রাখতে তাদের ছবি মোবাইলে তুলে নিলাম। তারপর বিদায় নিয়ে চলে এলাম ফ্রেডারিকা ও ক্লেমেন্সের সাথে।

এই ক্লেমেন্স ও ফ্রেডারিকা দম্পতির প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু এই দম্পতির প্রতি কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার ভাষা জানা নেই। কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা এত কম, এত সীমাবদ্ধ কেন? ইউরোপে আসার পর থেকে, সেই এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে স্বাগত জানানো থেকে শুরু করে আজ অবধি এই প্রাকৃতিক দূর্যোপূর্ণ রাতে বিপদ থেকে মুক্ত করতে ছুটে আসা এই দম্পতির প্রতি কোন ভাষায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবো? কোন শব্দই যে যথেষ্ট নয়। তাদের নিয়ে জমে থ াকা হৃদয় মাঝারে গড়ে তোলা কৃতজ্ঞতার ডালি না হয় অন্যদিন নিবেদন করা যাবে। আজ অন্তত স্বর্গীয় দূতের ন্যায় ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত মারুসিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকি। হ্যা, মারুসিয়া, যেন সত্যিই স্বর্গের কোন দূত, কিংবা মানবী। দেখতেও মারুসিয়া ঠিক স্বর্গের অপ্সরা। স্বর্গের কোন দূত নিজ চোখে কোনদিন প্রত্যক্ষ করিনি। কিন্তু, আজ, আমার দুর্দিনে, পৃথিবীর যে মানবীকে দেখলাম, তিনি যেন সত্যিই স্বর্গের কোন মানবী। ভক্তের বিপদে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত জীবন্ত স্বর্গীয় দূত। এভাবেই ঈশ্বর তার মুক্তির কাজ করেন। ভক্তের বিপদে, অসহায়ত্বে, সংকটে ঈশ্বর নিজেই এভাবে সাড়া দেন, উপস্থিত হন মারুসিয়াদের রূপ ধরে॥

# হাসি দিয়ে করি জয়

**জাসিন্তা আরেং**

**রা**নীর বয়স যখন নয় বছর, তখন সে প্রতিদিন রুটিন করে ভোরে ঘুম থেকে উঠে, দাদুর সাথে হাঁটতে যায়। হেঁটে এসে স্কুলের জন্য প্রস্তুত হয়। সে মিশনারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। দাদু তাকে অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যায়। সড়ক দুর্ঘটনায় রানীর মা-বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই দাদু তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলছে। স্কুলে যাবার পথে প্রতিদিন একটি মূর্তি চোখে পড়ে। রানী তার দাদুকে স্কুলে যাবার সময় একদিন জিজ্ঞেস করলো, "দাদু, এই মূর্তিটি কার? দাদু উত্তরে বললেন, "দিদিভাই, এটা সাধ্বী মাদার তেরেজা'র মূর্তি।" রানী আবার জিজ্ঞেস করলো, "দাদু, মাদার তেরেজা কে ছিলেন?" দাদু বললেন, "তিনি মহান একজন মানুষ ছিলেন। তিনি মানুষের রঙ, দেশী-পরদেশী এসবে বিশ্বাস করতেন না বরং সবাইকে ভালোবাসতেন।" রানী বললো, "মনে হয় তিনি অনেক দয়ালু ছিলেন।" দাদু বললেন, "একশো ভাগ ঠিক কথা বলেছো, দিদিভাই। তিনি তোমার মতো শিশুদের কোলে নিতেন ও অনেক আদর করতেন।" রানী বললো, "মাদার তেরেজা কি আমার মতো এতিম শিশুদেরও ভালোবাসতেন? হ্যাঁ দাদুভাই, খুবই ভালোবাসতেন।" এসব গল্প করতে-করতেই কখন যে স্কুলের গেইটে পৌঁছে গেলো টেরই পেলো না। দাদু বললো, "দিদিভাই, আমরা তোমার স্কুলে পৌঁছে গেছি, এখন ক্লাসে যাও ও মন দিয়ে শিক্ষকদের কথা শুনবে। মনে আছে তো, স্কুল থেকে ফিরে আমার কাছে পড়া দিতে হবে!" রানী বললো, "মনে আছে দাদুভাই। তুমি চিন্তা করো না; আমি মন দিয়ে শিক্ষকের কথা শুনবো।" এরপর রানী ও দাদু দুজনই হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

ক্লাসে গিয়েও কারও সাথে কথা বলতো না রানী। কথা বললেও কারও সাথে হেসে কথা বলতো না। গোমরামুখ করে রানী তার সহপাঠিদের সাথে মিশতো। কিন্তু তার সহপাঠিরা সবাই সুন্দর করে হেসে তার সাথে কথা বলতো, মিশতে চাইতো। কিন্তু

সে মুখ কালো করে বসে থাকতো, মিশতে চাইতো না। সেজন্য, তার সহপাঠিরা তাকে পছন্দ করতো না। সেও মাঝে-মাঝে অনুভব করতো যে তার ব্যবহার কেউ পছন্দ করে না। একদিন শিক্ষক রানী ও তার এক সহপাঠিকে জোড়ায় একটি কাজ দিয়ে বললেন, কাজটি শেষ করে মাদার তেরেজা'র জন্মদিনে তা সবার সামনে উপস্থাপন করবে। এসব কথা শুনে রানীর মুখ আরও বেশি বেজার হয়ে গেলো। তার বেজার মুখ দেখে তার সহপাঠি বলেই ফেললো যে, "স্যার, বেজারমুখো মেয়েটিতো আমার সাথে মিশতেই চায় না। কি করে কাজ করবো তার সাথে?" শিক্ষক তার কথা শুনে রীতিমত অবাক হলেন। রানীও খুব কষ্ট পেলো। তখন শিক্ষক রানীকে কাছে ডেকে বললেন, "রানী, তুমি একজন ভালো ছাত্রী, তোমাকে আমি একটা ছোট্ট উপদেশ দেই।" রানী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। শিক্ষক তাকে বললেন, "তুমি স্কুলে আসার পথে কি কোন মূর্তি দেখতে পাও?" রানী কিছুক্ষণ ভেবে বললো, "হ্যাঁ স্যার, বড় একটি মূর্তি দেখতে পাই। আমার দাদু বলেছেন, সেটা মাদার তেরেজা'র মূর্তি।" শিক্ষক বললেন, "দাদু একদম ঠিক বলেছেন। তুমি কি সেখানে আর কিছু খেয়াল করেছো?" রানী উত্তর দিলো, "স্যার আমি এমন কোন কিছুই দেখতে পাইনি। ওখানে এমন কি আছে স্যার?" শিক্ষক বললেন, "মূর্তিটির সামনে যাবে আর মনোযোগ সহকারে সবকিছু লক্ষ্য করবে, কেমন? সে উত্তর দিলো, "জি স্যার"। শিক্ষক আরও বললেন, "আর ওখানে কি আছে তা তোমাকেই আবিষ্কার করতে হবে।" সেখান থেকে যা আবিষ্কার করবে, তা তুমি তোমার জীবনে কাজে লাগাবে।" স্যারের নির্দেশমতে সে মাদার তেরেজা'র মূর্তির সামনে গিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে দাদুর সাথে বাড়ি ফিরে গেলো।

সে দাদুকে সেদিনের সব ঘটনা খুলে বললো। দাদু মনে-মনে বুঝতে পারলো, শিক্ষক আসলে কি আবিষ্কার করতে বলেছেন। কিন্তু রানীকে কিছু বললেন না। তিনি শুধু তাকে বললেন, "কাল সকালে সেখানে যাবে এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করবে। দাদুর কথা মাথায় রেখে সে আবার মূর্তিটির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো। হঠাৎ মূর্তিটির নিচের দিকে বাংলায় একটা লাইন দেখতে পেলো। সে আধো-আধো করে লেখাটি পড়লো, "এসো আমরা সবসময় হাসিমুখে কথা বলি; কারণ হাসি দিয়েই ভালোবাসা শুরু হয়।" এই লাইনটি পড়ে রানী উপলব্ধি করলো যে, হাসিমুখে সকলের সাথে কথা বলাটাও কতোটা জরুরি যা সে মোটেই করে না। এরপর থেকে সে আর বেজারমুখ করে কারও সাথে কথা বলে না। সকল সহপাঠি এখন তাকে পছন্দ করে ও ভালোবাসে।

পরিশেষে, রানী মাদার তেরেজা'র জন্মদিনে একটি নাটক উপস্থাপন করলো যার মূলভাব ছিলো-

এসো হাসিমুখে করি জয়,
তোমার-আমার সকলের হৃদয়॥

# বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

## দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ মিয়ানমারের নেতাদের সমালোচনা করেন কার্ডিনাল বো

মিয়ানমারের কাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মীয় নেতা কার্ডিনাল চার্লস বো গত রবিবার ২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে খ্রিস্টযাগের উপদেশে মিয়ানমারের এই সময়ের তথাকথিত নেতাদেরকে তাদের নেতৃত্ব দানের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বলে তিরস্কার করেন। তিনি দিনের মঙ্গলসমাচারের আলোকে নেতাদের কথা বলতে গিয়ে বলেন, মিয়ানমারের নেতৃবর্গ মানুষের হৃদয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন বিধি-নিষেধ তৈরি করে মিয়ানমারে মৃত্যু ও হতাশা নিয়ে এসেছে। কোভিড-১৯ এর ১৮

মাসে জীবন-জীবিকার অনেক ক্ষতি হয়েছে; ৭ মাসের গৃহযুদ্ধে এসেছে অসন্তুষ্টি, মৃত্যু ও হতাশা। আর এমনিভাবে প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগের স্তব-গীতিকা বৃদ্ধি পেয়ে মিয়ানমারের জনগণের নীরব কান্নার রাত্রি দীর্ঘায়িত হচ্ছে। মিয়ানমারের আও সাং সূচির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলকারী সামরিকবাহিনীর দুর্ভোগ সৃষ্টি করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ কথা বলেন। তথাপি মিয়ানমারের জনগণের ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও উদারতার প্রশংসা করেন কার্ডিনাল মহোদয়।

**মাথা ও হৃদয়:** সাধু যাকোবের পত্রের আলোকে ৭২ বছরের কার্ডিনাল বো খ্রিস্টানদের কাছে আহ্বান রাখেন যেন তারা শুধু মাত্র বাণীর শ্রোতাই না হয় কিন্তু তারা যেন বাণীর পালনকারী হয়। ভালবাসা ও দয়ার আজ্ঞা থেকে সরে গিয়ে শাস্ত্রী-ফরিশীরা বাহ্যিক নিয়ম-কানুনকে আক্ষরিকভাবে পালনে ব্যতিব্যস্ত থাকায় তারা যিশুর শিষ্যদের হাত না ধুয়ে খাবার গ্রহণকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা যিশুকে চ্যালেঞ্জ করেন, কেন তাঁর শিষ্যেরা প্রাচীনদের নিয়ম-নীতি পালন করেন না। কার্ডিনাল বো শাস্ত্রের এ অংশের আলোকে বলেন, আমাদের যাত্রা হলো মাথা থেকে হৃদয়ে প্রবেশ করার; ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আরো অধিকতর সত্যের দিকে যাত্রা যা উৎসরিত হয় ভালবাসা থেকে। গত ৭ মাসে যেসকল মৃত্যু ও হতাশা নেমে এসেছে তা শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত নিয়ম-নীতির ফল। ভালবাসার মধ্যদিয়েই নিয়মের উর্ধ্বে উঠতে হবে। নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে বেরিয়ে ভালবাসাকেন্দ্রিক হৃদয়ের দিকে এগিয়ে চলতে হবে।

**মাথা থেকে হৃদয়ে যাওয়া জীবনব্যাপি এক সাধনা:** শারীরিক গঠনে মাথা থেকে হৃদয়ের দুরত্ব মাত্র ১৮ ইঞ্চি। বিভিন্ন ধারণা, চিন্তা ও নিয়মনীতির উৎসস্থান মাথা থেকে ভালবাসাতে পূর্ণ হৃদয়ে যাওয়া সারাজীবনের যাত্রা। যখন মাথা ও হৃদয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকে তখনই খাঁটিত্ব অর্জন করা সম্ভব। সম্ভব ফরিশী থেকে যিশুর শিষ্য হয়ে উঠা, নির্যাতক সরকার থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্মী হওয়া এবং অসত্য থেকে সত্যে যাওয়া। কার্ডিনাল বো মিয়ানমারের নাগরিকদের উদাত্ত আহ্বান রাখেন যেন তারা তাদের প্রতিদিনকার জীবনে দয়া ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে এগিয়ে চলে। যারা আমাদের শাসন করে তাদের মাথা ও হৃদয়ের বৈপরীত্য আমাদের জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা নিয়ে এসেছে। বর্তমানের জান্তা সরকার সারা বিশ্ব থেকে অস্ত্র কিনে নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তি দৃঢ় করার প্রচেষ্টা করছে। কার্ডিনাল বো আহ্বান রাখেন, আসুন, আমরা একে অপরের প্রতি ভালবাসায় নিজেদেরকে সজ্জিত করি। কেননা সত্যিকারের খাঁটিত্ব ভালবাসার মাধ্যমেই আসে।

## কোভিড-১৯ এর মধ্যে ফিলিপাইনের ডাইয়োসিসে ৪০ দিনের উপবাস ও কৃচ্ছসাধন

ফিলিপাইনে যখন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে তখন দেশটির দক্ষিণের একজন বিশপ তার ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান করছেন ৪০ দিনের উপবাস ও কৃচ্ছসাধনের আধ্যাত্মিক যাত্রায় অংশ নিতে। ফিলিপাইনে গত ২৬/৮/২১ তারিখে ১৬, ৩১৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং ২৩৬ জন মারা গেছেন। দেশটিতে সর্বমোট আক্রান্ত হয়েছে ১,৮৯৯,২২২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩২,৭২৮ জনের। সারাদেশেই তবে বিশেষভাবে মেট্রো ম্যানিলাতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছেই।

**৪০ দিনের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী:** জামবোয়াঙ্গা আর্চডাইয়োসিসের প্রৈরিতিক প্রশাসক বিশপ মইসেস কুইয়োভাস এক বিবৃতির মধ্য দিয়ে ৪০দিনের বিশেষ আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন যা সংগঠিত হবে ১৩ অক্টোবর থেকে নভেম্বর ২১ তারিখ পর্যন্ত। এ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে যারা

যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছেন তাদের সাথে একাত্ম হওয়া এবং মরুভূমিতে খ্রিস্টের প্রস্তুতির ও উপবাসের সময়কে স্মরণ করা।

১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা ৮টায় ডাইয়োসিসের সকল ধর্মপল্লীর গির্জার ঘন্টাগুলো একসাথে বেজে উঠবে এবং তারপরই পুরোহিত ও কিছু সংখ্যক খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে রোজারিমালা প্রার্থনা করা হবে। ৪৭ বছরের এই বিশপ জানান, ধারাবাহিকভাবে ধর্মশিক্ষা প্রস্তুত করা হয়েছে প্রায়শ্চিত্তমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলোতে ব্যবহার করার জন্যে। তিনি সকল পুরোহিতদের অনুরোধ করেন জনগণের সুবিধার্থে তারা যেন পাপস্বীকারের ব্যবস্থা রাখেন। ৪০ দিনের এই কর্মসূচী শেষ হবে ২১ নভেম্বর খ্রিস্টরাজার পর্বদিবসে প্রায়শ্চিত্তমূলক শোভাযাত্রার মাধ্যমে।

**একাত্মতার স্থানগুলো:** মহামারীর কারণে কোভিড -১৯ এ আক্রান্ত ও মৃত্যু ছাড়াও মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র পরিবার ও দিন মজুরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে দুর্বিসহ প্রভাব ফেলেছে। কোভিডের এই আতঙ্ক চলমান থাকলে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিকতা বিচ্যুত হবে এবং ভঙ্গুর জনগণ তাদের স্বাস্থ্যসেবাতে চরম ঝুঁকিতে থাকবেন। অনিশ্চয়তার মাঝেও যখন আমরা আমাদের মানসিক স্থিতিশীলতা রাখি এবং বর্তমান কঠিন অবস্থাতেও অসহায় নই তা মনে করি তাহলে আমরা অজানা ও সবচেয়ে অনিশ্চিত প্রান্ত অতিক্রম করছি। বিশপ মহোদয় অনুরোধ করেন দরিদ্র ও অসহায়দের কথা চিন্তা করে ধর্মপল্লীগুলোতে 'উপহার দানের স্থানগুলো' নির্দিষ্ট করতে হবে।

**পোপ মহোদয়ের টুইটার বার্তা:**

**১/৯/২০২১ :** ১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সৃষ্টির যত্নে প্রার্থনা দিবস। আমাদের সর্বজনীন বসতবাটী পৃথিবীর ক্রান্তিকালে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন অংশের ভাইবোনদের সাথে আসুন এক সাথে প্রার্থনা ও কাজ করি।

**৩১/৮/২১:** আজও আমাদের ভবিষ্যতবাণী দরকার কিন্তু তা হতে হবে প্রকৃত ভবিষ্যতবাণী। তা করতে অলৌকিক প্রকাশের দরকার নেই; কিন্তু দরকার সেইরুপ জীবন যা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করে।

**৩০/৮/২১ :** ধন্য ও সুখী জীবনের গোপন রহস্য কী? জীবন্ত ঈশ্বর হিসেবে যিশুকে চিনতে পারা। ইতিহাসে যিশু মহান ছিলেন তা জানতে পারাটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমি তাঁকে আমার জীবনে কোথায় স্থান দিয়েছি।

তথ্যসূত্র : news.va

# সিবিসিবি সেন্টারে সিবিসিবি কমিশনগুলোর সেক্রেটারী, বিভিন্ন ডেস্ক প্রধান ও ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা

**নিজস্ব সংবাদাদাতা** ▯ সিবিসিবি'র কো-অর্ডিনেটিং কমিটির উদ্যোগে গত ২৭ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে সিবিসিবি সেন্টারে সিবিসিবি কমিশনগুলোর সেক্রেটারী, বিভিন্ন ডেস্ক প্রধান ও ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সিবিসিবি'র সেক্রেটারী জেনারেল ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের সেক্রেটারী বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগতম জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সভায় অংশগ্রহণ করেছেন বলে। তিনি জানান, সিবিসিবি'র কমিশনগুলো বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটে ধর্মপ্রদেশগুলোতে। তাই কমিশনগুলোর সেক্রেটারীদের সাথে ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিদের এই সভা খুব অর্থপূর্ণ ও গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশ মণ্ডলীকে গতিশীল ও সচল রাখতে এখানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের যথেষ্ট ভূমিকা থাকবে। তাই এই সভায় সকলকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার আহ্বান রাখেন বিশপ কুবি।

সভার সঞ্চালক ও সিবিসিবি'র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা সিবিসিবি'র কমিশনগুলোর ধরণ ও কাজ নিয়ে সবিস্তারে উপস্থাপনা রাখেন। কমিশনগুলোর সাথে ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিনিধিদের সভা করার অন্যতম কারণ হলো পারস্পরিক কর্ম পরিকল্পনা জ্ঞাত হয়ে সমন্বিত কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সদস্য ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল রোজারিও সাধু যোসেফ ও পরিবার বর্ষ নিয়ে তথ্য ও প্রস্তাবনা সমৃদ্ধ উপস্থাপনা রাখেন। সভাতে পোপ মহোদয়ের সর্বজনীন পত্র লাউদাতো সি/তোমার প্রশংসা হোক নিয়ে উপস্থাপনা রাখেন যুব কমিশনের সদস্য জুঁই ক্লারা বিশ্বাস এবং ফ্রাতেল্লী তুত্তি/সবাই ভাই-বোন নিয়ে স্বপ্নীল ক্রুজ। তাদের সাবলীল উপস্থাপনা ও চিন্তার সহভাগিতা সভার সকলকে স্পর্শ করে। পোপ মহোদয়দের ও মণ্ডলীর বিভিন্ন শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের জানার ঘাটতি স্বীকার করে নিয়ে ধন্যবাদ জানান এ সুন্দর সুযোগ দানের জন্য। একই সাথে আহ্বান রাখেন সকল যুবক-যুবতীদের মাঝে পোপ ও মণ্ডলীর শিক্ষা ছড়িয়ে দেবার জন্য যুগোপযোগী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করতে। সভার শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভার সভাপতি বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সভা শেষ হয়। সভাতে সিবিসিবি'র সেক্রেটারী জেনারেল বিশপ পল পনেন কুবিসহ বেশ কয়েকজন ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও খ্রিস্টভক্ত নিয়ে মোট ৩৯জন উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে পুরুষ ২৮জন এবং নারী ১১জন॥

# বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে মা-মারীয়ার নতুন গ্রোটো উদ্বোধন

**নিজস্ব সংবাদদাতা** ▯ বিগত ২৮ আগস্ট ২০২১ খ্রি: শনিবার যিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে মা-মারীয়ার গ্রোটো উদ্বোধন করা হয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু করেন। খ্রিস্টযাগে তাঁকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাবিয়ান মারান্ডী, সহকারী পুরোহিত বাপ্পী এন. ক্রুশ ও আরো দুইজন পুরোহিত এবং তিনজন সিস্টারসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত প্রায় ৫০০জনের বেশী খ্রিস্টভক্তগ। বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন মা-মারীয়া হলেন আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারের রাণী, তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। পরিবারে আমাদের মাকে যেমন আমরা ভালবাসি তার যত্ন করি ঠিক তেমনিভাবে এই মাকেও আমাদের যত্ন নিতে হবে,

ভালবাসতে হবে এবং তাঁর কাছে আসতে হবে। তাঁর যেন কোন অযত্ন বা অবহেলা না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে এই মায়ের কাছে এসে প্রার্থনা করতে হবে। তাই এই গ্রোটোর নাম হবে 'পরিবারের রাণী মা-মারীয়া' গ্রোটো। খ্রিস্টযাগ শেষে বিশপ মহোদয় লাল ফিতা কাটার মাধ্যমে গ্রোটোতে প্রবেশ করেন ও পবিত্র জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে গ্রোটো আর্শিবাদ ক'রে গ্রোটোতে মারীয়ার মূর্তি স্থাপন করেন। ধর্মপল্লীর পক্ষে বিশপ মহোদয় ও সকল ফাদার-সিস্টারকে ফুলের মালা ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অতপর: পাল-পুরোহিত গ্রোটো নির্মাণে যারা সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন তাদের এই উদারতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শেষে সকলকে টিফিন প্রদানের মধ্য দিয়ে গ্রোটো উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

## বগুড়ায় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

**মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক** ▯ গত ২০ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, বগুড়ার কিছু উৎসাহী খ্রীষ্টিয়ান যুবাদের নিয়ে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ বিকাল ৪টায় বগুড়া মমতাজ উদ্দিন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দু'টি দল সিনিয়র এবং জুনিয়র অংশগ্রহণ করেন। খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হয়। উক্ত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন ড: ডেভিড রিন্টু দাস, পি.এস.ও. বাংলাদেশ ফিসারিজ রিচার্স সেন্টার, বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মো: জাকারিয়া আদিল, দপ্তর সম্পাদক, বগুড়া যুবলীগ এবং রেভা: সৌরভ বিশ্বাস, বগুড়া খ্রিস্টীয় মণ্ডলী। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথির সহধর্মীনি ডা. প্যাট্রিসিয়া গায়ত্রী চ্যাটার্জী, গাইনী ও সার্জন বিশেষজ্ঞ, বগুড়া মিশন হাসপাতাল, প্রকৌশলী মার্টিন রোনাল্ড প্রামানিক, ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিপণন), মট্স ও মি. রওনাক হোসেন মনা। খোলার ধারাভাষ্য বর্ণনা করেন মি. আন্দ্রিয় মল্লিক॥

## বিশিষ্ট লেখক নিধন ডি'রোজারিওকে স্মরণ

**সুমন কোড়াইয়া** ▯ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হলো কথাসাহিত্যিক নিধন ডি'রোজারিওকে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট এই লেখকের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ১০ আগস্ট। এই দিনে বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম আয়োজিত এক অনলাইন আলোচনা সভায় প্রয়াত নিধন ডি'রোজারিওর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন বক্তাগণ। সাহিত্য আলোচনায় ফোরামের সেক্রেটারি সুমন কোড়াইয়ার সঞ্চালনায় ফোরামের সভাপতি লেখক খোকন কোড়ায়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন নিধন ডি'রোজারিওর ছেলে আগস্টিন অমল ডি'রোজারিও, নিধন ডি'রোজারিওর মেয়ে শিবা ডি'রোজারিও, জামাতা তপন রবি রড্রিক্স, গীতিকার ও লেখক উইলিয়াম অতুল কুলুম্ভনু, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, গল্পকার ও নাট্যকার সুনীল পেরেরা, লেখক ও কবি জেন কুম কুম ডি'ক্রুজ, কবি ও গবেষক রঞ্জনা বিশ্বাস,

এলড্রিক বিশ্বাস ও স্বপ্না বার্ণাডেট ফ্রান্সিস। বক্তাগণ বলেন, নিধন ডি'রোজারিওর লেখা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীসহ তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হতো। তাঁর লেখা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতো। তাঁর সব লেখা দিয়ে একটি বই প্রকাশ করার অনুরোধ করেন আলোচকবৃন্দ ও তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করা হয়। তাঁর রেখে যাওয়া সাহিত্যের জন্য লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আলোচনায় আরও উপস্থিত ছিলেন ফোরামের ভাইস-প্রেসিডেন্ট দিপালী এম গমেজ, সহ-সেক্রেটারি উইলিয়াম রনি গমেজ, কার্যকরি সদস্য মিল্টন রোজারিও, সিস্টার মেরী প্রশান্ত, এসএমআরএ, নিধন ডি'রোজারিওর মেয়ে পান্না ডি'রোজারিও, ফাদার সাগর কোড়াইয়া, নয়ন যোসেফ গমেজ, কবি সিলভেস্টার জুয়েল রোজারিওসহ প্রয়াত লেখকের অন্যান্য স্বজন ও বেশ কয়েকজন লেখক ও পাঠকবৃন্দ।

উল্লেখ্য, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানার অন্তর্গত শুলপুর ধর্মপল্লীর সন্তান নিধন ডি'রোজারিও দূরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ আগস্ট ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন॥

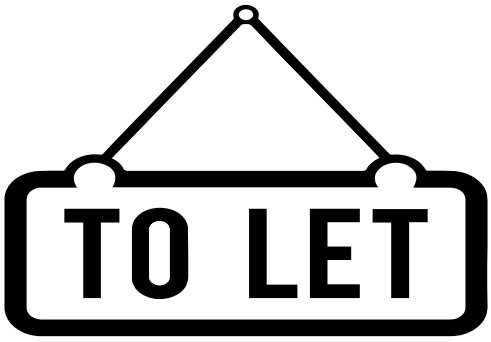


NEER-4, EAST TEJTURI BAZAR (HONDA GOLI) FLAT : B-3, 1245 SQARE FEET, 2 BEDS, DRAWING, DINING SPACE

01814875760

ONLY CHRISTIAN FAMILY

বিজ্ঞ/২৩৩/২১


**"সে আমায় মনে প্রাণে মেনেছে বলেই তাকে রক্ষা করবো আমি"**
**অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তাকে**

## প্রয়াত ডেলফিনা কোড়াইয়া

**জন্ম :** ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
**মৃত্যু :** ১৫ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভার্দাস্তী, তুমিলিয়া মিশন
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

আমাদের সকলের আদরের পিসিমণি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গত ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পৃথিবীর মায়া মোহ ত্যাগ করে পরম পিতার কোলো আশ্রয় নিয়েছেন। তার আত্মার চির শান্তির জন্য সকলের নিকট প্রার্থনার অনুরোধ করি। পিসিমণি অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে অনেকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, বিশেষভাবে যারা অর্থ দিয়ে পিসিমণির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, আমাদের পাশে ছিলেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুণ।

**শোকার্ত পরিবারবর্গ**
**ভাইজি-জিনিয়া গমেজ, জামাই-কিশোর**
**নাতী-জেরী জেরাল্ড গমেজ**
**সকল ভাইস্তা, ভাস্তি, নাতি, নাতিন ও পরিবারবর্গ।**

বিজ্ঞ/২৪৩/২১

## ফাদার লিউ জে. সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন

ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর-সাভার, জেলা-ঢাকা
স্থাপিতঃ ১৯৬০ খ্রীঃ, রেজি.নং-৮-১০/১০/১৯৮৫ খ্রীঃ ও ৪২-৩/১২/২০০৩ খ্রীঃ
Phone : 01865024508, 01877758671. E-mail: dcccu.ltd@gmail.com

## নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২০ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অন্যান্য কমিটির যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ ও পর্যবেক্ষক পরিষদের নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভা আগামী ২৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার ধরেন্ডা পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে সকাল ৮টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভায় সম্মানিত সকল সদস্যকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

**সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে**

মাইকেল জন গমেজ
প্রেসিডেন্ট
ডিসিসিসিইউএলটিডি

জুয়েল সিরিল কস্তা
সেক্রেটারি
ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিজ্ঞ/২৩২/২১

# স্মৃতিতে অম্লান তুমি

**ক্যাথরিনা কাকলী গমেজ**
জন্ম : ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে সাতটি বছর কিভাবে কেটে গেল! গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪-তে ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে ক্যাথরিনা কাকলী গমেজ আমাদের ছেড়ে পরম করুণাময়ের কাছে চলে গেছেন। তোমার অভাব জীবন চলার প্রতিটি ধাপে অনুভূত হয়, অনেক অসহায় মনে হয়। যেখানেই যাই আর যা কিছুই করি তোমার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তোমাকে আমরা রাখতে পারিনি। বাগানের প্রিয় ফুলটি ঈশ্বরকে দিয়েছি ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেই। পরম করুণাময় পিতা তোমাকে অবশ্যই স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো আমাদের মধ্যে যেন শান্তি ফিরে আসে, সন্তানদের যেন তোমার ইচ্ছানুযায়ী ভাল মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি। তোমার ক্যান্সার-এর চিকিৎসার সময় যারা দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও প্রার্থনা করি। তোমার স্মৃতি ও ভালবাসা আমাদের মধ্যে সব সময় অটুট থাকবে। ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে সুখী করুন।

*এই কামনায়–*
পলাশ ডেজমন্ড গমেজ
ও ক্যাথরিনা প্রভা গমেজ
ছেলে : ডিভাইন ও মেয়ে : সুপ্রিতা
মা : লিলিয়ান নীলু গমেজ
এবং পরিবারবর্গ
রোনাল্ড হাউস, হাসনাবাদ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৩১/২১

# সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

## বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি নাটক লেখেন?
- আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক। নাট্যাংশে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনী।
- আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

**পরিচালক**
**খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 32
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা-৩২
Regd. No. DA-33
❖ 5 - 11 September, 2021, ২১-২৭ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সিস্টার গ্লোরিয়া ও জেমস্ শিমন দাস রচিত 'মনোবিজ্ঞান চর্চা' (২০২১) বইটি বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বেশ প্রসিদ্ধ একটি বই। ৫০৬ পৃষ্ঠার বইটি যেকোন ব্যক্তিই তার নিজস্ব সংগ্রহে রাখতে পারবেন। ভাবছেন বইটি কেন কিনবেন ? তাহলে আসুন বইটি সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক।

- মোট পনেরটি (১৫) অধ্যায়ে ২২০ টিরও বেশি সাইকোলজিক্যাল টুলস্ ও টেকনিকের (Psychological Tools and Techniques) ব্যবহার
- কীভাবে মানসিক রোগ উৎপত্তি লাভ এবং দীর্ঘদিন একজন ব্যক্তির মধ্যে বাসা বাধে সে সম্পর্কে আলোচনা
- বিষণ্নতা কি, কারণ এবং বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠার কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা
- আত্মবিশ্বাসহীনতা চিহ্নিতকরণ, কারণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধীয় বিবরণ
- উদ্বিগ্নতার কারণ, ধরন ও মোকাবিলার কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা
- ট্রমা, ট্রমাটিক ঘটনা সম্পর্কিত প্রচন্ড মানসিক চাপ ও পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD) সনাক্তকরণ এবং মোকাবিলা ও হ্রাসকরণ সম্পর্কে আলোচনা
- ব্যক্তিগত, ছাত্রজীবন, পেশাগত ও আধুনিক জীবনের মানসিক চাপের কারণ, মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী প্রভাবক এবং মানসিক চাপ হ্রাস, মোকাবিলা ও গ্রহণের উপায় সম্বন্ধীয় আলোচনা
- ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে সীমারেখা নির্ধারণের গুরত্ব, সীমারেখার প্রকারভেদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত সুরক্ষিত সীমারেখা বজায় রাখার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা
- দাম্পত্য জীবনকে আরো সুন্দর, তাৎপর্যমন্ডিত ও স্বাস্থ্যসম্মত করার জন্য গ্যারি চ্যাপম্যানের ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের পাঁচটি ভাষা বা মাধ্যম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।

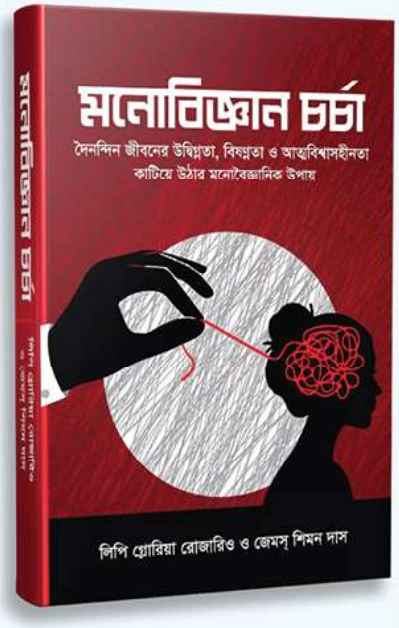


বইটি ক্রয় করতে আজই যোগাযোগ করুন।
বাসা-১২১, ব্লক-বি, রোড-৬
বসুন্ধরা আবাসিক আ/এ, ঢাকা-১২২৯
হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট, কারলত্তা সেন্টার
মোবাইল: ০১৭৫২-০৭৪ ৪৯৭ ও ০১৬২২-৯২৯ ৩৯৭

বিজ্ঞ/২২৯/২১

## প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

## আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

**আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।**

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

| | | | |
|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্ড | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫ E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org